বিভাবতী বসু

যাঁর সযত্নে গুছিয়ে রাখা পুরোন চিঠিপত্র
ও ফটোগ্রাফের সঞ্চয় পাথেয় করে
নেতাজী সংগ্রহশালার যাত্রা শুরু

ভূমিকা

আজ মনে হয় যাবার পথে দুস্তর বাধা থাকা সত্ত্বেও য়ুরোপে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালই করেছিলাম। কারণ বিদেশ ভ্রমণ আমি আগেও করেছি, কিন্তু এবারকার সফরের মত চিত্তাকর্ষক ও তথ্যসমৃদ্ধ ভ্রমণের সুযোগ আগে হয়নি। এবারকার বিদেশ যাত্রার বলা যায় একটি মিশন ছিল। সেই মিশন সার্থক করে তুলতে সুভাষচন্দ্রের য়ুরোপীয় অনুরাগীরা একন্তভাবে সহযোগিতা করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘ প্রবাস জীবন যাপনের ফলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে য়ুরোপের একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখদুর্দশার কথা ও স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর ত্যাগ ও সংগ্রামের বার্তা বহন করে সুভাষচন্দ্র বার বার য়ুরোপে এসেছেন। তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হয়নি। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে তুলতে উনি সমর্থ হয়েছিলেন। অপরদিকে য়ুরোপ থেকে নানা নূতন ধরনের ভাবধারায়, নূতন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে উনি স্বদেশে ফিরে যেতেন এবং কি ভাবে সেইসব দেশের কাজে লাগাবেন তাই ভাবতেন। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি য়ুরোপের রণাঙ্গনই নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে দেশত্যাগ করলেন। অতএব য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে নানা তথ্য যে ছড়িয়ে আছে তা আর এমন বিচিত্র কি!

এবারকার য়ুরোপ সফরের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তার উৎস প্রধানত দু'ধরনের। এক. নেতাজীর য়ুরোপ প্রবাসের সময় তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন অথবা একসঙ্গে কাজ করেছেন এমন কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডাঃ ওয়ার্থ, মিঃ নাম্বিয়ার, ডাঃ ফ্রাংক, শ্রীমতী এমিলি ও বালকৃষ্ণ শর্মা প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়েন। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের স্মৃতিকথা কিছু লিখেছেন, অনেকে কিছুই লেখেননি। তাঁদের এই স্মৃতিচারণের আলাদা মূল্য আছে। দ্বিতীয় উৎস হল বিভিন্ন আর্কাইভস্-এ সংগৃহীত ডকুমেন্ট, চিঠিপত্র এবং পুরোন খবর কাগজের সংগ্রহ। এদিক দিয়ে বন, হামবুর্গ ও লন্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সংগ্রহালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া নেতাজী সম্পর্কে আর এক ধরনের আগ্রহী ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, যাদের বলা চলে নেতাজী স্কলার। য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে এমনি অনেক স্কলার রয়েছেন যারা নেতাজীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। এদের অনেকেই নেতাজীকে ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত চিনতেন না কিন্তু এদের রিসার্চের বিষয়বস্তু হিসেবে নেতাজী এদের একান্ত পরিচিত।

ইংলন্ড, আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে অনেকেই নেতাজীর ওপর কাজ করছেন এ খবর আমাদের আগেই জানা ছিল। দেখে ভাল লাগল যে পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলিতেও নেতাজী সম্পর্কে আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা চলছে। প্রাগ, বার্লিন ও পটসডামে তার পরিচয় পেলাম। এই একটা বিষয়ে—অর্থাৎ নেতাজী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও শ্রদ্ধায় পূর্ব ও পশ্চিম য়ুরোপ উভয়ে সমান অংশীদার। সত্যি কথা বলতে কি, নেতাজী সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা ও মূল্যায়নের ব্যাপারে বিশ্বের আর সব দেশই জেগে উঠেছে—কিন্তু ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

প্রধানত দুটি সম্মেলনে যোগ দেবার সূত্রে আমাদের বিদেশ যাত্রা। চেকোশ্লো-ভাকিয়ার প্রাগ শহরে একটি নেতাজী সেমিনার হয়েছিল ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে। প্রায় একই সময় পশ্চিম জার্মানীর বন শহরে আর একটি নেতাজী সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন নেতাজীর জার্মান অনুরাগীরা। এই দুটি সম্মেলন ছাড়াও তথ্যের সন্ধানে য়ুরোপের অন্যান্য শহরে ঘুরবার সময় অনেকগুলি ছোটখাট বৈঠক ও আলোচনাচক্রে যোগ দেবার সুযোগও আমাদের হয়েছিল।

প্রথমে যাত্রার শুরুতেই ভিয়েনাতে দিনকতক বিশ্রাম। সুভাষচন্দ্রের প্রিয় শহর এই ভিয়েনা। কখনো লিওপোলড্‌স্‌বার্গ-এ পাহাড়ের চূড়ায়, কখনো শ্যোনবুর্গ-প্যালেসের সুরম্য বাগানে বেড়িয়ে সময় কাটালাম ক'দিন। পরে বুঝেছিলাম এই বিশ্রামটুকু কত মূল্যবান হয়েছিল।

ভিয়েনার পরই অকস্মাৎ একটা কর্মব্যস্ত ঝটিকা সফর শুরু হল। প্রাগ, বার্লিন, বন, হামবুর্গ—কখনো এখানে, কখনো সেখানে। কাজ আর কাজ। কত বিচিত্র সব লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পুরোন ফাইল, পুরোন কাগজপত্র ঘাঁটা। এমনিতেই ক্রমাগত এরোপ্লেনে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা করলে কেমন যেন ভারসাম্য নষ্ট হবার উপক্রম হয়। তার উপর যে কাজে লেগেছি তার ধারাই এমন যে বিভিন্ন কালে মনে মনে বিচরণ করতে হয়। কখনো লোথার ফ্রাংকের সঙ্গে ১৯৩৩-এ থাকি, কখনো আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থের সঙ্গে ১৯৪৩-এ, কখনো বা নাম্বিয়ারের সঙ্গে ত্রিশ, চল্লিশ উভয় দশকে। আর ওটেন সাহেব তো ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন ১৯১৬ সালে। ফলে আমার অন্তত সাময়িকভাবে স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ সবই একাকার।

এই তালগোল পাকানো দিনগুলির জট ছাড়িয়ে একটা বলার মত কাহিনী যদি তৈরী হয়েই থাকে, তার অনেকখানি কৃতিত্ব 'দেশ' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের। য়ুরোপ থেকে ফিরবার পরই ওঁর কাছ থেকে নির্দেশ না এলে এই ভ্রমণ কথা লিপিবদ্ধ করা হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ।

এই সফরের সময় য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে সমস্ত কাগজপত্র, ফটোগ্রাফ হাতে এসেছে, যার অনেক কিছুই এই লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত—সে সমস্তই নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর আর্কাইভস্‌-এ প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু ছবি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর আগেকার সংগ্রহ থেকে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মুশকিল এই যে, এমনও অনেক জায়গা আছে যেখানে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলে না। প্রথমে য়ুরোপে প্রবাসে থাকার সময় ও পরে লেখার কাজ করার সময় সংসারধর্মে প্রচুর অবহেলা ঘটেছিল। সেই অবহেলা ছেলেমেয়েদের একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের দাদু-দিদিমার স্নেহচ্ছায়া তাদের ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু এখানে ধন্যবাদ অচল।

'দেশ' পত্রিকায় লেখাটি ধারাবাহিক প্রকাশের সময় বহু পাঠক আমাকে চিঠি লিখে, টেলিফোন করে এমন কি বাড়ীতে এসেও উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। লেখার কাজের সব স্তরে শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরীর কাছে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি সর্বদা।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, আনন্দ পাবলিশার্স-এর অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য 'ইতিহাসের সন্ধানে' দ্রুত ও সুমুদ্রণ সম্ভব হয়েছে।

১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা

কৃষ্ণা বসু

॥ এক ॥

এবারের বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটু অন্য ধরনের। বেড়াতে নয়, ঠিক পড়াশুনো করতেও নয়, চিকিৎসার জন্যও নয়, ব্যবসার খাতিরেও নয়—আমরা বিদেশে চলেছি কেন? না ইতিহাস খুঁজতে। তাও কিনা আবার নিজের দেশেরই ইতিহাস। এ কথা শুনে বন্ধুজনেরা যে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন সে আর আশ্চর্য কি!

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর একটি সম্মেলনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ এল। প্রায় একই সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর বন শহর থেকেও ডাক এল আর একটি নেতাজী সম্মেলনে যোগ দেবার। এই দুটি সম্মেলনেই বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল —Problems of research on Subhas Chandra Bose। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্ম নিয়ে যাঁরাই কিছু কাজ করেছেন তাঁরাই জানেন, এ বিষয়ে গবেষণার পথে অনেক জটিল সমস্যা। তার মধ্যে একটি সহজবোধ্য সমস্যা হল ভৌগোলিক। পৃথিবীর খুব কম নেতারই জীবনকথা এমনভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, সমগ্র য়ুরোপ, ইংলন্ড—সব দেশই ইতিহাসের ঘটনাচক্রে তাঁর বিপুল কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষ থেকে প্রাগ ও বন-এর সম্মেলনে যোগ দেবার সূত্রে অন্তত য়ুরোপের কয়েকটি জায়গায় নেতাজী সম্বন্ধে যে তথ্য ছড়িয়ে আছে তার একটা ধারণা করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে একদিন কথা প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের জনৈক অফিসার নেতাজীকে বললেন, নেতাজী, এই যে আজ আমরা আমাদের দেশের জন্য সাধ্যমত করছি, ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসুরীরা হয়তো এর কোন খবরই রাখবে না, আমাদের উচিত এর কিছু লিপিবদ্ধ করে যাওয়া। একটু চুপ করে থেকে তারপর ঈষৎ হেসে নেতাজী বলেছিলেন—এসো আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করি, ইতিহাস লেখার ভার অপর কেউ নেবে। নেতাজীর সেই ইতিহাস-সৃষ্টিকারী কীর্তিগাথা ছড়িয়ে আছে দেশে দেশান্তরে। য়ুরোপের অনেক জ্ঞানী গুণী, ভারত-তত্ত্ববিদ, ভারতপ্রেমিক তাই নিয়ে গবেষণা করছেন। পূর্ব ও পশ্চিম য়ুরোপে নেতাজী সম্বন্ধে এক নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আজ তাই তাঁর কর্ম ও জীবনের ওপর বই বার হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, কনফারেন্স বসছে। তারই কিছু আভাস পাবার সৌভাগ্যও এবারকার য়ুরোপ সফরে হল।

প্রাগ-এ নেতাজী সম্মেলন? ব্যাপারটা কি?—বলে অনেকেই সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন। ব্যাপারটা যে ঠিক কি তা গিয়ে উপস্থিত না-হওয়া পর্যন্ত আমিই কি জানতাম! তখন আমরা ভিয়েনাতে। নানা রাজনৈতিক এবং অ-রাজনৈতিক কারণে অস্ট্রিয়ানরা চেকদের সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে একটু ঠেস দিয়ে কথা বলে। ভিয়েনার খাবার টেবিলে অস্ট্রিয়ান বন্ধুরা প্রায়ই বলছিলেন—"প্রাগ-এ যাচ্ছ? খেতে পাবে না। ইউ উইল স্টার্ভ। এখানে ক'দিন খাওয়া-দাওয়া করে নাও।" প্রাগ-এ পেঁছবার পর যখন আতিথেয়তা ও সমাদরের ধাক্কা সামলাতে বিব্রত হচ্ছি

তখন ভিয়েনায় চিঠি লিখে দিলাম, "মাই ডিয়ার—, উই ডিড্ নট স্টার্ভ।"

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ঠিক যাবার মুহূর্তে নিজেই একটু দ্বিধান্বিত ছিলাম স্বীকার করছি। ভিয়েনা এয়ারপোর্টে আচমকা দেখা হয়ে গেল কলকাতার এক পাশ্চাত্ত্য সংগীতজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে। খুশি হয়ে তিনি বললেন, চলো, চলো, প্লেনে বসে বেশ গল্পসল্প করা যাবে। কিন্তু চেক এরোপ্লেন এমন বিপুল গর্জন করে আকাশে উঠল এবং যতক্ষণ রইল আকাশে গর্জন করেই চলল যে, গল্প করা দূরে থাক, প্রাগ-এ যখন নামলাম তখনো মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে। দু' হাতে দুটো বোঝা নিয়ে বিমান বন্দরের সুদীর্ঘ ঢালু করিডর পার হয়ে ধীরে ধীরে উঠছি, পাশ থেকে ভিয়েনার এক সহযাত্রী বললেন, ভাবছ বুঝি এসকালেটর আছে, নেই কিন্তু। তা না থাক, প্রাগ-এর এয়ারপোর্ট বেশ ঝকঝকে সুন্দর, আধুনিক। প্রাগ-এর ব্রিটিশ কনসাল ম্যাকেনজি স্মিথ সাহেব (কলকাতার ভূতপূর্ব ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার) আমাদের সংগীতজ্ঞ বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে অন্য পথে উধাও হলেন, বোধ করি কোন ডিপ্লোমেটিক পথে। আমি তখন পাসপোর্ট কন্ট্রোল-এ দাঁড়িয়ে আছি এবং পাসপোর্ট অফিসার মর্মভেদী দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আর একবার পাসপোর্টের ছবির দিকে তাকাচ্ছেন। অবশ্য মিলিয়ে দেখাই নিয়ম, তবুও ভাবছি অতটা তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ কি একান্ত প্রয়োজন?

কিন্তু পাসপোর্টের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে যেতেই দেখি প্রাগ-এর ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ডাঃ মিলোস্লাভ ক্রাসা এবং তাঁর তরুণ সহকর্মী ডাঃ ভজোটেক চেলকো এগিয়ে আসছেন, হাতে ফুলের তোড়া। 'ওয়েলকাম টু প্রাগ' বলে হাতে ফুলের গুচ্ছ ধরিয়ে দিলেন। হঠাৎ করেই যেন পরিবেশ সহজ ও অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। তখনো আমরা কাস্টমস্-এর ভিতর। কিন্তু সবকিছু ফর্ম্যালিটি বিনা বাধায় হয়ে গেল। অল্পক্ষণের ভিতরেই মস্ত টাট্রা গাড়ির সামনের বনেট তুলে পেটের ভিতর মালপত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ইনস্টিটিউটের বর্ষীয়ান ড্রাইভারকে ডাঃ ক্রাসা পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন। পরদিনের কর্মসূচী নিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

হোটেলে পেঁছতে একটি চেক তরুণী দু' হাত জোড় করে এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল—নমস্কার, কেমন আছেন? আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। ডাঃ ক্রাসা আলাপ করিয়ে দিলেন। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রী, প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত পড়েছে। বর্তমানে কাশীরাম দাসের মহাভারত নিয়ে কাজ করছে। বোজেনা সেই থেকে প্রাগ-এর ক'দিন আমাদের নিত্যসঙ্গী। পরদিনের কর্মসূচী আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে ডাঃ ক্রাসা, ডাঃ চেলকো ও বোজেনা বিদায় নিল। ক্রাসা বললেন, কাল কিন্তু বেশ হেভী প্রোগ্রাম। সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নিতে হবে। কষ্ট হবে না তো? জানো তো এদিকে রাত থাকতেই ভোরের আলো হয়ে যায়—দেখবে তাড়াতাড়িই ঘুম ভেঙে যাবে।

সকাল সকাল ডাইনিং হল-এ নেমে দ্রুত কনটিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছিলাম, তার আগেই বোজেনা এসে হাজির। বোজেনার সঙ্গে ইনস্টিটিউটের পথে চলেছি। প্রাগ শহর অনেকটা ভিয়েনার মতই—বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তবে কিছু ম্লান ও বিবর্ণ। ভিয়েনা এবার দেখে এলাম যেন বিশেষভাবে ঝলমল করছে। তবে প্রাগ-এ শুনলাম ঘর-বাড়ীর চেহারা কিছু মলিন হয়ে থাকাই রীতি, ওটা বনেদিয়ানার চিহ্ন। প্রাগ-এ আমাদের দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাশে মিঃ ঘোষ গল্প করছিলেন—জানেন, এখানে লোকে নূতন বাড়ি করেও পারলে দু' পোঁচ

কালো রং লাগিয়ে নেয়—কারণ ওটা আভিজাত্যের লক্ষণ। বোজেনা এটা-ওটা দেখাচ্ছিল, ন্যাশানাল থিয়েটর, দূরে পাহাড়ের ওপর প্রাগ কাস্‌ল। আমরা ভল্‌টাভা নদী পার হলাম। ওপারের শহর কিছু পুরনো। যে এলাকায় এসে পেঁছিলাম তার নাম মালা স্ট্রানা, বেশ রোমান্টিক নাম মনে হল। শুনলাম তার মানে lesser town। এর একপাশ দিয়ে সরু রাস্তা বেরিয়েছে। তার ওপর ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ডাঃ বসুর[১] পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল। বহুকাল আগে বাবার সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় এসেছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক লেসনির সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের কথা। প্রাগ-এর আবহাওয়া তখন থম্‌থমে। ডাঃ ক্রাসা বললেন, শরৎচন্দ্র বসু যখন প্রোফেসর লেসনির সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন আমি লেসনির সহকারী। সে সময় নিশ্চয় আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল।

ওপরের ঘরে সমবেত সহকর্মীদের সঙ্গে ডাঃ ক্রাসা আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন—বলে চলেছেন—ইনি অগাস্টাইন পালাট, এঁর বিষয় পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস; ইনি পাভেল পুসা, এক সময় ইণ্ডোলজি বিভাগের প্রধান ছিলেন, এঁর বিষয় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব; ইনি মেরহোটভা, বিষয় হল ভারতের ধর্ম; ডাঃ বেচকা, ইনি বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কাজ করছেন; আর শ্রীমতী ডাগমার বেচকোভা, এঁর বিষয় হল বর্মী সাহিত্য ও সংস্কৃতি; ডাঃ চেলকোর বিষয় মর্ডান ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি; ডাঃ হারজেরোভার বিষয় সংস্কৃত, গবেষণা করছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা নিয়ে; আর ডাঃ হোরাকোভার বিষয় হল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া; হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য পড়ছেন ডাঃ আনসারি। এত সুধীজনের সমাবেশে নিজেকে বেশ অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল। কে ভেবেছিল প্রাগ-এ এতজন ভারতবর্ষ ও এশিয়া বিশেষজ্ঞের দেখা মিলবে। এদের অনেকেই আমাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের চাইতে বেশীই জানেন। ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের কর্মীরা মোটামুটি ইংরেজি সবাই জানেন। আমাদের সেমিনার ইংরেজিতেই হল। ভীড় ঠেলে একজন সৌম্যদর্শন চেক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'নমস্কার, আমি একজন প্রবাসী বাঙালী।'

ইনি ডাঃ দুসান বাভিটেল। কলকাতার অনেকেই তাঁকে চিনবেন। ইনস্টিটিউটের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইণ্ডোলজি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান। প্রাগ-এ লোকে ওঁকে "দুসান বাবু" বলেই জানে। আমাদের কাছেও জেড্ দিয়ে শুরু বাভিটেল (Zbavitel) উচ্চারণ করার চাইতে দুসান বাবু ডাকাই সহজ মনে হল। কোপেনহেগেনের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপিকা ডাঃ বেনেডিক্‌টে আইলিয়ে সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিল। মেয়েটি সুপণ্ডিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার নখদর্পণে। বর্তমানে দাক্ষিণাত্যের ভূমিসংক্রান্ত অর্থনীতির উপর গবেষণা করছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে ওর আগ্রহ দেখে বললাম, তোমাকে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রকাশিত কিছু বই পাঠিয়ে দেবখন। সে সোৎসাহে বললে, নূতন বেরিয়েছে বুঝি? তোমাদের ব্যুরোর এই এই বই আমাদের ইনস্টিটিউটের আছে—বলে প্রায় পুরো বই-এর তালিকা গড়গড় করে বলে গেল। ব্যাপার দেখে চুপ করে গেলাম। প্রাগ-এ আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাটাশে উপস্থিত ছিলেন।

সকালবেলার সেসনে সাধারণভাবে নেতাজীর জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তৃতা ও

[১] ডাঃ শিশিরকুমার বসু, ডিরেকটর, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা।

আলোচনা হল। বিশেষ ভাবে আলোচনা হল নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণা ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা কি তাই নিয়ে। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের মত একটি অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা স্বভাবতই কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। ডাঃ বসুকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। ডাঃ ক্রাসা, ডাঃ বাভিটেল, ডাঃ বেনেডিকটে আইলিয়ে প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সময় অনেক ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন করে আমাদের অবাক করে দিলেন ডাঃ বেচ্‌কা। বার্মার স্বাধীনতা ওঁর বিষয় হওয়াতে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কোন কোন দিকে ও'র কমন ইন্টারেস্ট ছিল।

॥ দুই ॥

এই ধরনের সেমিনারে যা বড় লাভ, ভাবের আদান-প্রদান—ত' তো আছেই, তাছাড়াও উপরি আরো কিছু লাভ হল তথ্যের আদান-প্রদান। বর্মা বিশেষজ্ঞ বেচকা সন্ধান দিলেন কিছু নতুন কাগজপত্রের। তেমনি আমাদের সঙ্গে যে ফিলম আছে তাতে বা ম. উ নু প্রভৃতিকে দেখা যাবে জেনে তিনি বেজায় উৎসাহিত। কার্লসবাদের ওপর নেতাজীর একটি লেখার সন্ধান ডাঃ ক্রাসা আমাদের আগেই দিয়েছিলেন। খুঁজেপেতে সেই সব লেখা বার করে ক্রাসার জন্য আমরা নিয়েছিলাম। উনি খুব খুশী। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের একটি ছবি ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটে রাখবার জন্য ক্রাসার হাতে দেওয়া হল। নেতাজীর সই করা প্রাগ-এ তোলা একটি অমূল্য ছবি ক্রাসা আমাদের দিলেন। এছাড়া ইনস্টিটিউটের ভিজিটরস বুক-এ দুবার ও'র সই রয়েছে। ডাঃ বাভিটেল যোগাড় করে আনলেন রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ বইটি। সুভাষচন্দ্র উপহার দিয়েছেন চেকোশ্লোভাক-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে—প্রথম পাতায় নাম সই। সব-চাইতে অমূল্য জিনিস হল ডাঃ লেসনিকে লেখা সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় চিঠির একগোছা মাইক্রোফিলম্।

আলাপ-আলোচনা তীব্রবেগে চলেছিল, তারই মধ্যে ডাঃ ক্রাসা শান্তভাবে একবার ঘড়ি দেখলেন। লাঞ্চের সময় হয়েছে এবং লাঞ্চের সময় অন্য এক জরুরী সাক্ষাৎ-কারের ব্যবস্থা করা আছে। ডাঃ মিলোস্লাভ ক্রাসাকে দেখলে বোঝা যায় একজন সত্যিকারের অ্যাকাডেমিক লোক কেমন হয়। ও'র পাণ্ডিত্যের একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি আছে কিন্তু কোন জ্বালা নেই। ও'র নিরভিমান পাণ্ডিত্য তার সঙ্গে শান্ত অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, কথাবার্তা বলার ভঙ্গী, এমন কি দীর্ঘ ছিপছিপে দৈহিক গড়ন সব কিছু আমাকে কার কথা যেন মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। সেদিন কিছুতেই ভেবে পেলাম না—কার কথা।

অসমাপ্ত আলোচনা রেখে উঠে পড়তে হল। ক্রাসা আমাদের নিয়ে চললেন। গাড়ি দেখি পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে—বুঝলাম প্রাগ কাস্‌লের দিকে চলেছি। প্রাগ-এর প্রাসাদের খুব কাছেই চেকোশ্লোভাক ইনস্টিটিউট ফর ইনটারন্যাশনাল রিলেশনস্‌-এর বাড়ি। সেখানে এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটর ডাঃ মিলান য়ানকোভেচ্ (Jankovec) এবং ভারত বিষয়ে সদস্য ডাঃ জির্নাড্রিক্ কোভার আনুষ্ঠানিক-ভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা শুরু হল। কারণ ডিরেকটর সাহেব ইংরেজি বলেন না। আমরা প্রাগ-এ আসাতে ও'রা কত আনন্দিত হয়েছেন, এর ফলে ইন্দো-চেকোশ্লোভাক বন্ধুত্ব নিঃসন্দেহে আরো সুদৃঢ় ও দীর্ঘ-

স্থায়ী হবে। আমাদের দুই মহান দেশের মধ্যে সম্পর্ক আজকের নয়—রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এবং নেহরু চেকোশ্লোভাকিয়াতে অতি পরিচিত ও সম্মানিত নাম—এই ধরনের বক্তব্য প্রথমে চেক ভাষায় ও পরে ইংরেজিতে আমাদের কাছে নিবেদন করা হল। আমরাও যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এই কথাবার্তার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ খবর যেটুকু তা হল এই যে, সুভাষচন্দ্রকে প্রাগ-এর চেকোশ্লোভাক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এ'রা নিজেদের অর্থাৎ ইনটার-ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউটেরই একজন বলে মনে করেন। প্রোফেসর লের্সনির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র এক সঙ্গে এই সোসাইটির গোড়া পত্তন করেছিলেন। ১৯৩৪-এর মে মাসে প্রাগ-এর লোবকোভিৎস্ প্রাসাদে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সভায় সুভাষ-চন্দ্র বক্তৃতা করেছিলেন। আগে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সোসাইটি ছিল। বর্তমানে নূতন রাষ্ট্রিক কাঠামোতে সব কিছু কেন্দ্রীভূত করে গড়ে উঠেছে—চেকোশ্লোভাক ইনস্টিটিউট ফর ইনটার-ন্যাশান্যাল রিলেশনস।

আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাপর্ব চুকবার পর সহজভাবে কথাবার্তা শুরু হল। একসঙ্গে হে'টে পাশেই প্রাগ কাসল-এ এলাম। প্রাসাদ দেখবার সুযোগ সেদিন ছিল না। তবুও চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। পাহাড়ের ওপর সুন্দর গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রাসাদ, নীচে প্রাগ শহর। বহুকাল আগে যুদ্ধেরও আগে ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট ঐ বাড়িতে ছিল—বলে ক্রাসা অপরদিকে পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ি দেখালেন। কাছাকাছি আর একটা বাড়িতে আমেরিকান এমব্যাসি, বাড়ির চূড়ায় পতপত করে আমেরিকান ফ্ল্যাগ উড়ছে, একটু যেন বেখাপ্পা রকম চোখে পড়ছে। ওপাশে একটা প্রাসাদের মত বাড়ি—ওটা চীনা দূতাবাস। ভারতীয় দূতাবাসের এক বন্ধু গল্প করছিলেন, তিনি প্রাগ-এ সবে পোস্টেড হয়েছেন, প্রথম নিমন্ত্রণ হল চীনা দূতাবাস থেকে। যেতে হবে কি হবে না ওপরতলার নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন। তার মাত্র অল্পদিন আগেই মাও সে-তুং হেসেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা খুব ডেলিকেট স্টেজে আছে। শেষ মুহূর্তে নির্দেশ এল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। উনি এবং তাঁর স্ত্রী মিষ্ট হাসি এবং ভাল ব্যবহারই পেয়েছিলেন।

কথাবার্তা বলতে বলতে আমরা প্রাগ কাসল-এ ঢুকে পড়লাম। গেট দিয়ে ঢুকতেই একটা বিরাট, সুন্দর ক্যাথিড্রেল। প্রাসাদের ডান দিকের অংশে চেক প্রেসিডেনটের কর্মস্থল। আমরা বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। সেখানে 'ভির্কাকা'—বিশিষ্ট প্রাগ রেস্তোরাঁ। খাঁটি চেক খাদ্যসম্ভার দিয়ে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছিল। শুরু হল একটা হজমি জাতীয় জল দিয়ে। প্রাগের অনতিদূরে কার্লসবাদ বা কার্লোভি ভারি যায় সবাই স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। সেখানে রয়েছে পনেরোটি 'স্পা' বা উষ্ণজলের ঝর্না। কোনটার জলে গলব্লাডার সারে, কোনটায় বা ব্রংকাইটিস। তাই এই মানুষের হাতের তৈরী হজমী পানীয়কে ওরা সমাদর করে বলে ষোড়শ স্পা, বা 16th Spring। বড় বড় মাংসের বল দেওয়া স্যুপ থেকে শুরু করে চকোলেট তর্তে জাতীয় ডেজার্টে পেঁছনোর ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজব চলছিল। কোভার দেশ কয়েকবার ভারতবর্ষে এসেছেন, খবরাখবর রাখেন। কিন্তু ডিরেকটর সাহেবের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বেশী, উনি কখনো আসেননি। ওঁর এরিয়া ভিয়েতনাম। যথা সময়ে ক্রাসা ঘড়ির দিকে চাইলেন। ইনস্টিটিউটের বৈকালিক অধিবেশনের সময় হয়ে এসেছে।

অসমাপ্ত আলোচনার রেশ ধরে অধিবেশন শুরু হল। ক্রাসা বলছিলেন প্রাগ-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা। এ বিষয়ে উনি বিস্তর পড়াশুনো

করেছেন। ১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্র প্রথমবার এলেন প্রাগে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডওয়ার্ড বেনেস সরকারীভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে চেক জনসাধারণের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি। এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, সুদূর পূর্ব ইউরোপের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া সেই প্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের খবরাখবর রাখত। ক্রাসার মতে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য দিয়ে এই দুই দেশের সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। বিশের দশকে চেক মনীষী অধ্যাপক লেসনি, মরিজ উইনটারনিৎস, শিল্পী নেভকভস্কি সবাই শান্তিনিকেতনে ঘুরে গেছেন। অধ্যাপক লেসনির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের স্বদেশেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল। প্রাগ-এ আসবার পর ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউট ও লেসনির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়তর হল। সেবার উনি কার্লসবাদ বা কার্লোভি ভারিও গিয়েছিলেন। চেক সাপ্তাহিক চিন (Cin) পত্রিকায় নেতাজীর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে উনি চেকোশ্লোভাকিয়া ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন।

একটি চেকোশ্লোভাক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করার ইচ্ছা এই সময়েই নেতাজীর মনে দেখা দেয়। লেসনির সঙ্গে পরবর্তী চিঠিপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। ১৯৩৪-এ আবার যখন প্রাগে এলেন তখন এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হল। ৪ঠা মে ১৯৩৪, প্রাগের লোবকোভিৎস প্যালেসে সুভাষচন্দ্র অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সভায় বক্তৃতা করলেন। সেই প্রথম পূর্ব ইউরোপে নেতাজী পরাধীন ভারতবর্ষের বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরবার সুযোগ পেলেন। সেই বছরেই শরৎকালে নেতাজী বেশ কিছুদিন কার্লোভি ভারিতে কাটিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৩৫-এর জানুয়ারী আর ১৯৩৬-এর জানুয়ারী এক বছরের ব্যবধানে নেতাজী প্রাগে এলেন দু' বার। চেক গভর্মেণ্টের দিক থেকে উনি দু'বার দু' ধরনের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যবহার পেলেন। প্রথমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ বেনেস প্রাগের ব্রিটিশ কনসালেটের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য নেতাজীকে সাক্ষাৎ করতে অনুমতি দিতে পারলেন না। অবশ্য ডাঃ লেসনি ও ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে নেতাজীর অন্তরঙ্গতা ও কর্মতৎপরতা বেড়েই চলল। কিন্তু পরের বার তিনি যখন এলেন ডাঃ এডওয়ার্ড বেনেস তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট। প্রেসিডেণ্ট বেনেস এবার ওঁর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করলেন। বেনেসের সঙ্গে নেতাজীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল ছিল। কিন্তু এবারের এই বিশেষ অভ্যর্থনার অন্য কারণও হয়ত ছিল। নেতাজী বার্লিন যাচ্ছিলেন। সবাই জানত বার্লিনে অনেক উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ওঁর দেখা হবার কথা। সেবার তাই উনি একটু বিশেষ অভ্যর্থনা পান।

চেক সাংবাদিক সাইনেকের বেশ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেবার। চেক সংবাদপত্রে এই অভিজ্ঞতার বিবরণ সাইনেক দিয়েছিলেন। নেতাজীর সঙ্গে এক জাহাজে সাইনেক ইউরোপ থেকে বম্বেতে পেঁছান। সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। একদিকে উল্লসিত জনতা তাদের নেতাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে, অপরদিকে পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ থেকে নেমে আসা মাত্র পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এরপর কংগ্রেসের ভাবী প্রেসিডেণ্টরূপে সুভাষচন্দ্র প্রাগে এলেন ১৯৩৮-এর জানুয়ারীতে। প্রেসিডেন্ট বেনেসের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল এবারও। হরিপুরা কংগ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্র চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করলেন। তা ছাড়া মিউনিক এগ্রিমেণ্টের পরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চেকোশ্লোভাকিয়াকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে প্রেসিডেণ্ট

বেনেসের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্য নেতাজীর আন্তরিক উৎকণ্ঠার পরিচয় চেকরা মনে রেখেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় নেতাজী প্রাগ-এ এসেছিলেন না আসেননি তাই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হল। কেউ যেন সঠিক জানে না। ক্রাসা যতদূর জানেন, আসেননি। অধ্যাপক লের্সনির ছেলে ডাক্তার লের্সনিরও তাই মত। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধানে আমাদের এই অভিযানের শেষের দিকে আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে, তখন জানতে পারলাম যুদ্ধ চলার সময় নেতাজী একবার প্রাগ-এ এসেছিলেন। দেখতে এসেছিলেন পরাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া কেমন করে চলছে। সহকর্মী নাম্বিয়ারকে উনি বললেন, কোন ভেদ নেই, ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের সংগে কোন তফাত নেই। যেমন করে ওরা আমাদের শাসন করে আজ চেকোশ্লোভাকিয়া একইভাবে অত্যাচারিত। শাসনকর্তা হাইড্রিখ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কাজের ধারা দেখে নেতাজীর লর্ড ক্লাইভের কথা মনে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় এই সফর অত্যন্ত গোপন ছিল তাই এর খবর বিশেষ কেউ জানেন না। অধ্যাপক লের্সনিকে উনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একবার লের্সনির কাছে যাবার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত না-যাওয়াই স্থির করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি নেতাজীর দুর্বলতা ছিল। লের্সনিকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন— "Your country has had a peculiar fascination for me." তাই চেকোশ্লোভাকিয়ার লাঞ্ছনা দেখে নেতাজী বিচলিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন।

অপরদিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের মনে নেতাজী সম্বন্ধে রয়েছে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি। নেতাজী যে যুদ্ধের সময় তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য নাৎসী জার্মানীর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন, এ ঘটনায় তাদের মনে নেতাজী সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র ছিল না। কারণ সেইসব দিনগুলির জন্য জার্মানদের ওরা আজও মনে মনে ক্ষমা করে উঠতে পারেনি। একটা জেনারেশন যারা যুদ্ধের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনে আছে গভীর তিক্ততা।

একদিন প্রাগে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে জার্মান ভাষা জানে কিনা। কারণ চেকোশ্লোভাকিয়াতে অনেকেই জার্মান অল্পবিস্তর জানে। সে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, জার্মান ভাষা শিখতে আমার ইচ্ছা হয় না, আমার বিতৃষ্ণা হয়। আমার বিস্মিত মুখের ভাব দেখে সে নিজেই বললে, আমি জানি তোমার কাছে কথাটা খুবই 'সিলি' শোনাবে, আমি একথাও জানি সব জার্মানই কিছু খারাপ নয়। কিন্তু কি করব বল, আমি বড় হয়েছি যুদ্ধের মধ্যে। জার্মানদের ওপর আমার একটা বদ্ধমূল বিরাগ আছে, তাই আমি কিছুতেই জার্মান ভাষা শিখে উঠতে পারিনি।

আজকের দিনে যারা চেকোশ্লোভাকিয়ার ওরিয়েন্টাল স্কলার তারা অনেকেই এই জেনারেশনেরই লোক। তবুও সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি কেন? এ সম্বন্ধে ডাঃ ক্রাসা বলেছিলেন, ভিন্নমতের লোক একেবারে নেই তা হয়ত নয়। কিন্তু যারাই সুভাষচন্দ্রকে জানতেন অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে না জানলেও স্টাডি করেছেন, তারাই জানেন উনি কোনোদিন ফ্যাসিস্ট ছিলেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ক্রাসা বলছিলেন, ও'র মত প্রোগ্রেসিভ বা প্রগতিবাদী মানুষের পক্ষে ফ্যাসিস্ট হওয়া অসম্ভব ছিল। লের্সনিকে লেখা চিঠিপত্রে দেখতে পাওয়া যায়, সেই ১৯৩৪ বা '৩৫ সালেও জার্মানীতে কর্মরত ভারতীয়দের ও অধ্যয়নরত ছাত্রদের উনি চেকোশ্লোভাকিয়াতে কাজকর্ম ও পড়াশুনোর বিকল্প

ব্যবস্থা করে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

তিনজন মহান ভারতীয়দের প্রতি চেকোশ্লোভাকিয়াতে বিশেষ আগ্রহ ও ভালবাসা লক্ষ্য করেছি—রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও নেহরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সুভাষচন্দ্রের প্রতি ওদের এই যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

॥ তিন ॥

অধ্যাপক লেসনির ছেলে ডাক্তার, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট। তার সঙ্গে একদিন দীর্ঘ আলোচনা হল। কাজ, বেড়ানো, এনটারটেনমেণ্ট সব কিছু ডাঃ ক্রাসা প্রাগের প্রোগ্রামে নিখুঁতভাবে প্ল্যান করে রেখেছেন। লেসনি জুনিয়ারের সঙ্গে আমরা "ল্যাটার্না ম্যাজিকা" দেখেছিলাম। প্রাগ-এ বেড়াতে এলে ল্যাটার্না ম্যাজিকা দেখতেই হয়—ওটা একটা মাস্‌ট্‌। থিয়েটার ও সিনেমার সমন্বয়। পাত্রপাত্রীরা কখনো সিনেমার পর্দায়, কখনো বা সশরীরে স্টেজে উপস্থিত। টেকনিক্যাল বিস্ময় বটে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তবে শিল্পকলা হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য তা তর্কাতীত নয়। শংকরস্কোপ আমার দেখা হয়ে ওঠেনি, উদয়শংকরের প্রেরণা এখান থেকে কিনা বলতে পারি না। যাই হোক, শো শেষ হয়ে যাবার পর লেসনি সাহেব বললেন, থিয়েটারে বসে তো কথাবার্তা কিছু হল না, এসো কোথাও একটু বসি। রাত যদিও গভীর হয়েছিল, একটা কফি হাউসে বসে পুরনো দিনের কথা শুরু হল। কফি হাউসে ঢুকে ডাঃ বসু আবার এদিক ওদিক চাইছেন। জায়গাটা কেন চেনা মনে হচ্ছে? লেসনি বললেন, "উল্টো দিকের দরজাটা দেখছো, ওটা অমুক ক্লাব। আমার বাবা এর মেম্বার ছিলেন এবং অতিথি অভ্যাগতদের এখানেই ডাকতেন। সেবার শরৎচন্দ্র বসুকে এখানেই উনি ডিনার দিয়েছিলেন।" খাওয়াতে ভালবাসতেন লেসনি সাহেব। সুভাষচন্দ্রের চিঠিতে দেখতে পাই, হয়ত লিখছেন—অমুক দিনে আমি প্রাগে পৌঁছব, কিন্তু আপনি যেন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না—যখনি আসি তখনি তো আপনি খাওয়ান। কথায় কথায় ডাক্তার লেসনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন—আমাদের পরিবার তোমাদের কাছে একান্তভাবে ঋণী। কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ও'র দিকে তাকিয়ে আছি। উনি বললেন, "যুদ্ধের সময় আমার বাবাকে নাৎসীরা ধরে নিয়ে যায়। প্রাণে বাঁচবার আশা কমই ছিল। নিরুপায় হয়ে আমি বার্লিনে সুভাষচন্দ্র বসুকে একখানা চিঠি লিখে সব জানাই। তার অল্পদিনের মধ্যেই ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলে বাবার প্রাণ রক্ষা হয়।" এই চিঠি লেখার ঘটনাটা এই প্রথম শুনলাম। সাধারণভাবে একথা আগেই শুনেছিলাম যে উনি নেতাজীর বন্ধু, অধ্যাপক লেসনির এই পরিচয় সেই দুঃসময়ে রক্ষা কবচের কাজ করেছিল।

চেক ভাষায় লেখা প্রোগ্রামে চোখ বুলিয়ে আগেই দেখেছিলাম বিকেলের অধিবেশনে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে "পানি রুকা বোসোভা"র নাম লেখা আছে। 'বোসোভা' ধ্বনিটি কানে বেশ লাগল। তবে পানি মানে কি তখন জানতাম না, পরে জেনেছিলাম। আমাদের কালচারেল অ্যাফেয়ার্স অ্যাটাশে মিঃ জৈনের বাড়ি সন্ধ্যায় আলোচনার ছোট আসর বসেছিল। রাত্রে আমাদের পৌঁছে দিতে বেরিয়ে জৈন সাহেব রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। নির্জন পথে এক ভদ্রমহিলা হেঁটে চলেছেন। গাড়ি থেকে মুখ বার করে বিপন্ন জৈন সাহেব হঠাৎ "পানি, পানি" বলে হাঁক দিয়ে

উঠলেন। তখনি শুনলাম পানি মানে মিসেস বা ম্যাডাম।

চা-এর বিরতির ঠিক আগে আমার নিজের পেপার পড়তে ডাক পড়ল। নেতাজীর জীবনে কয়েকটি রমণী সম্পর্কে আমি কিছু বলেছিলাম। মোটের উপর আমি বলতে চেয়েছিলাম নেতাজীর জীবনে তথা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী রূপে কয়েকটি নারীর নীরব দান কম নয়, আমাদের দেখা উচিত তাঁরা যেন ইতিহাসে উপেক্ষিত না হন। আমার বক্তব্যে ডাঃ ক্রাসা, ডাঃ বাভিটেল প্রভৃতির সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু চা খেতে খেতে বেনেডিকটে ও অন্যান্য কয়েকজন আমার বক্তব্য সম্বন্ধে তাদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে সে কথা বলছিল।

তারা বলছিল, অমুকের জীবনে নারী—এই ধরনের কিছু বললেই একটা রোমান্স ও রহস্যের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু যে ক'জন নারী নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তার মধ্যে বেশীর ভাগই মাতৃস্থানীয়া। পাশ্চাত্য জগতের কাছে এটা একটু দুর্বোধ্য ঠেকে। সবাই মা—? ও'র নিজের মা তো রয়েছেন, তারপর দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবী তাঁকেও বললেন, 'মাগো', আমার মেজবউদিদি, তিনিও ও'র জীবনে 'সেকেন্ড মাদার'। এ কি এক ধরনের মাদার কমপ্লেকস্? ওদের বলছিলাম আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর জীবনে এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় সংগ্রাম বন্দেমাতরম্ মন্ত্র দিয়ে শুরু। "কি ভগবান কি স্বদেশ—আমাদের আরাধ্য যা কিছু—আমরা তাহা মাতৃমূর্তিরূপে কল্পনা করেছি"—নেতাজীর এই কথার তাৎপর্য আমার বিদেশী শ্রোতাদের যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলছিলাম।

পাশের ঘরে তখন প্রাগ রেডিওর সংবাদদাতা মারি হলভাচকোভা রেডিওর পক্ষ থেকে ডাঃ বসুকে ইনটারভিউ করছেন। প্রশ্ন করছেন, স্বাধীনতার আগে ভারতবাসীর কাছে সুভাষচন্দ্রের ভাবমূর্তি কি ছিল? উত্তরঃ সুভাষচন্দ্র আমাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের নায়ক ছিলেন। প্রশ্নঃ স্বাধীনতার পর ভারতবাসীর মনে সুভাষচন্দ্রের কোন্ আদর্শ সবচাইতে বেশী জেগে আছে?

উত্তর ঃ সমাজবাদের ভিত্তিতে নূতন ভারতবর্ষ তিনি গঠন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেই আদর্শ।

ঘর অন্ধকার করে নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ডকুমেন্টারি ছবি শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন করছেন। ভিত্তি স্থাপন উৎসবে মঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—দুজনই চেকদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সমবেত চেক দর্শকরা অভিভূত। কাঁপা কাঁপা গলায় কবি আবৃত্তি করছেন বাংলার মাটি, বাংলার জল—পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান। হরিপুরা, ত্রিপুরি পর্ব পার হল। শেষের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকান্ড দেখানো হচ্ছে। একটি বিশেষ দৃশ্যে নেতাজী সুপ্রীম কমানডারের পোশাক পরিহিত, এরোপ্লেন থেকে দৃপ্ত পদক্ষেপে নেমে এলেন। বিমানবন্দরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অভ্যর্থনা করছেন নেতাজীকে। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল, আরো একটা, আরো একটা—নেতাজীর মুখের স্মিত হাসি ফুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এবার কে যেন হাতে গুঁজে দিল মস্ত এক ফুলের তোড়া। গলায় মালার স্তূপ, ফুলের তোড়া হাতে এগিয়ে আসছেন নেতাজী। বেনেডিকটে হঠাৎ অন্ধকারে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে—দিস ইজ নট দি ফেস অফ এ সোলজার, দিস ইজ দি ফেস অফ এ সেণ্ট (saint)! বেনেডিকটের মন্তব্যে হঠাৎ চমকে গেলাম। সমস্ত পর্দা জুড়ে তখন সুভাষচন্দ্রের মাল্যশোভিত মুখ; স্নিগ্ধ—যেন বুদ্ধদেবের মত করুণাঘন অভিব্যক্তি।

প্রাগ-এর বাঙালী ও ভারতীয় বন্ধুরা পরে বিশেষভাবে অনুযোগ করেছিলেন—প্রাগ-এ সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা সভা হল, বিশেষত একটা ডকুমেণ্টারি ছবি দেখানো হল, আমরা দেখতে পেলাম না, একটু খবর পেলাম না? ভারতীয় দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে শ্রীঘোষের বাড়ি ডিনারে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, তাঁরাই বলছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ আস্ত মাছ কিনে এনে বাথ-টবে জিইয়ে রেখেছিলেন। তাই দিয়ে সুস্বাদু ডিনার প্রস্তুত করেছেন, সঙ্গে আছে ঘরে তৈরী সন্দেশ। খেতে খেতে দোষটা যে ঠিক কোথায় তা আর খোঁজ করে উঠতে পারলাম না। আমাদের এমব্যাসি অবশ্যই খবর পেয়েছিল। কারণ তাঁদের কালচারেল এফেয়ার্স অ্যাটাশে স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাই হয়ত ভারতীয়দের ঠিকমত জানিয়ে উঠতে পারেননি। অথবা এও হতে পারে ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট একটি একান্তভাবে অ্যাকাডেমিক সেমিনারই চেয়েছিলেন, তাই অযথা ভিড় বাড়াননি। পরে বন-এ যে সম্মেলন হল তা আকারে অনেক বড় ছিল, জাঁকজমকও বেশী ছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, প্রাগ-এর সেমিনারের আকাডেমিক চরিত্রই এর বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে কাজের কথা বলা, ঘরোয়া আলাপ আলোচনা করা সহজ হয়েছিল। একটি বিশেষ বিষয়ে একান্তভাবে আগ্রহান্বিত একদল নরনারী মিলিত হলেই সেটা সম্ভব হয়।

ডাঃ ক্রাসা নির্দেশ দিলেন সেমিনারের কাজকর্মের অঙ্গ হিসেবে কার্লসবাদ বা কার্লোভি ভারি অবশ্যই যেতে হবে। কার্লোভি ভারি সুভাষচন্দ্রের প্রিয় জায়গা। একাধিকবার তিনি এখানে এসেছেন। ১৯৩৪-এর শরৎকালে একটানা দু'মাস উনি এখানে ছিলেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, সেই সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বই লেখার কাজও চলছিল। অতএব কার্লসবাদের ওপর নেতাজীর লেখাটি গাইড হিসেবে নিয়ে রওনা হওয়া গেল। প্রাগ থেকে কার্লোভি ভারি পথটি মনোরম। মাঝে মাঝেই পথের দুধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা আঙুরলতার চাষ।

কার্লোভি ভারি ছবির মত সুন্দর। চারিদিকে গাঢ় সবুজ পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে ছোট উপত্যকা। বাড়িগুলি সার সার পুরনো ধাঁচের সুশ্রী দেখতে। ওরই মধ্যে দেখি একপাশে বিরাট এক মাল্‌টি স্টোরি প্রাসাদ মাথা তুলছে। শুনলাম এক বিরাট আধুনিক হোটেল তৈরি হচ্ছে। এখনো শেষ হয়নি, কাজ চলছে। সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাবেক কালের ঘরবাড়ির সুসমঞ্জস সৌন্দর্যের মধ্যে মূর্তিমান ছন্দপতনের মত দাঁড়িয়ে আছে এই অট্টালিকা। দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। কোথাও গিয়ে এদের হাত থেকে নিস্তার নেই।

কার্লোভি ভারির প্রধান রাজপথ গড়ে উঠেছে উষ্ণ জলের প্রস্রবণগুলির পাশ দিয়ে। দলে দলে নরনারী পদচারণা করছে রাস্তার ওপর। সকলের হাতে হুঁকোর মত দেখতে হাতল দেওয়া সুদৃশ্য কাঁচের পাত্র। তাতে ঝরনার স্বাস্থ্যকর উষ্ণ পানীয় ঢেলে সবাই চুমুক দিচ্ছে। হাতের জলের পাত্রে মাঝে মাঝে চুমুক দেওয়া চলছে আর গম্ভীর মুখে সবাই হাঁটছে—সে এক মজার দৃশ্য। আমরাও জল নিয়ে একই ভঙ্গীতে হাঁটা ধরলাম। একে গরম জল, তায় নোনতা, প্রথমবার এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করলাম। তবে আমার মনে হয় আধুনিক কবিতা বা আধুনিক ছবি বুঝবার জন্য যেমন মন ও চোখ তৈরি করতে হয়—কার্লোভি ভারির জলের জন্যও তেমন রুচি তৈরি করে নিতে হয়। প্রথমবারের মত পরে অত খারাপ লাগল না। এর বেশ কিছুদিন পরে যখন জার্মানীর উইসবাডেনে গিয়ে আবার উষ্ণ জলের প্রস্রবণের জল খেলাম তখন রীতিমত সুস্বাদু লাগল।

পথে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ছে একাধিক বাড়িতে প্লাক লাগানো—এই বাড়িতে

গ্যেটে থাকতেন। সবশুদ্ধ তেরোবার উনি এখানে এসেছেন। গ্যেটে বলে গেছেন, কার্লোভি ভারির উষ্ণ জল পান করে উনি নবজীবন লাভ করেছেন। আর একটি বাড়ির গায়ে লেখা চোখে পড়ল—কার্ল মার্কস এখানে বাস করেছেন। আমরা তখন নেতাজী কোন বাড়িতে থাকতেন খুঁজে বেড়াচ্ছি। নেতাজী লিখছেন আলেকজান্দ্রা, কয়র্নিগন-এ কুরহাউস-এ (kurhaus) উনি আছেন, সে জায়গাটি মোটের উপর শস্তা অথচ আরামের অভাব নেই। এতকাল পরে রাস্তাঘাটের নাম বদলে গেছে, দু'এক জায়গায় বাড়ি মেরামত করে চেহারা গেছে একদম পাল্টে। হলে কি হবে, আমাদের থেকে চেক বন্ধুদের উৎসাহ বেশী। বাড়িতে বাড়িতে নক করে ঢুকে অনুসন্ধান শুরু হল। শেষ পর্যন্ত বোজেনা সে বাড়ি আবিষ্কার করে তবে ছাড়ল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাড়িটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল, একটা প্লাক কি কোনদিন লাগবে না এ বাড়ির গায়ে—ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এখানে এই বাড়িতে ছিলেন?

বাড়িটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এদের স্বস্তি ছিল না। এবার নিশ্চিন্ত মনে ফুনিকুলার অর্থাৎ পাহাড়ের ট্রেনে চড়ে ওপরে উঠে গেলাম। নেতাজীর কার্লসবাদের ওপর লেখা মাঝে মাঝেই সবাই খুলে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে। নেতাজী বলছেন আমাদের দেশে কেন এমনটি হবে না! আমাদের যেমন পাহাড়ের ওপর সুন্দর শহর আছে, আছে সমুদ্রের ধারের শহর, তেমনি আমাদের উষ্ণ জলের ঝরনাও রয়েছে। শুধু গভর্নমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটির অবহেলার জন্যই এ ঝরনাগুলি ঘিরে ভ্রমণেচ্ছুদের জন্য সুন্দর কিছু গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এতে যেমন দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যোদ্ধারে যেতে পারে তেমনি বিদেশী ট্যুরিস্ট এলে আমাদের আয়ের পথ সুগম হয়। ক্রাসা বলছিলেন—কথাগুলো নেতাজীর উপযুক্ত, যেখানে যা ভাল ও নূতন দেখতেন স্বদেশে কিভাবে তা প্রয়োগ করা যায় সেই কথা ভাবতেন। ক্রাসা মনে করিয়ে দিলেন, নেতাজীর কথাগুলো আমরা এখনো কার্যকর করতে পারিনি।

পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা কত যে রাস্তা উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে চোখে পড়ে অপূর্ব প্যানোরামা। এক এক রাস্তায় উঠতে এক এক পথের মোড়ে এক এক রকম দৃশ্য। নেতাজী লিখেছেন, এই পথগুলিতে হাঁটতে তাঁর বড়ই ভাল লাগত। পরিশ্রান্ত হলে জিরিয়ে নাও, পথের বাঁকে বেঞ্চি পাতা আছে। পাহাড়ের ওপর রয়েছে কফি হাউস। নামবার সময় আমরা আর ফুনিকুলার চড়লাম না। নির্জন বনপথে হেঁটে নামতে লাগলাম। মনে হল এ পথে সুভাষচন্দ্রের পায়ের চিহ্ন পড়েছে বহুবার। পথের পাশে ঐ যে শূন্য বেঞ্চি, কে জানে হয়ত ঠিক ওখানে বসেই উনি খবর কাগজ পড়েছেন।

রাজা চতুর্থ চার্লস হলেন কার্লসবাদের আবিষ্কারক। গল্প আছে, উনি শিকারে বেরিয়েছেন, এক হরিণ পাথরের ওপর থেকে লাফ দিল। দেখতে পেয়ে কুকুরগুলি তাড়া দিয়ে এগিয়ে গেছে, এমন সময় রাজার কানে এল তার এক কুকুরের মর্মভেদী আর্তনাদ। ছুটে এসে দেখেন কুকুরটি গরম জলের ঝরনায় পড়ে পুড়ে গেছে। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় কার্লসবাদ আবিষ্কৃত হল। একটি হরিণের মূর্তি দিয়ে জায়গাটি চিহ্নিত রয়েছে।

কাছাকাছি আরো এই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। নেতাজীই লিখেছেন ১৯৩৩-এ উনি ফ্রান্সেজবাদ গিয়েছিলেন, অসুস্থ বিঠলভাই প্যাটেল ওখানে ছিলেন। ওখানকার জল হার্টের অসুখের পক্ষে ভাল। এ ছাড়া আছে মারিয়ানবাদ, জোয়াকিমস্থাল। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি কার্লসবাদেরই বেশী। এখানকার জলে সব

রকমের পেটের রোগ, গলব্লাডারের অসুখ, লিভারের অসুখ সারে। জল ছাড়া কার্লোভি ভারির পোর্সেলিন বিখ্যাত। দোকানের কাঁচের আড়ালে কাটগ্লাসের অপূর্ব সমারোহ। সতৃষ্ণ নয়নে কফির পেয়ালা দেখছিলাম, ভিতরে সোনালী রং ঝকমক করছে। এই ভিতরে সোনালী কাজ করা কাপ কার্লসবাদের বিশেষত্ব। উইন্ডো শপিং পর্যন্তই হল—'নাহিলে খরচ বাড়ে।'

মনে পড়ল ভিয়েনায় একদিন আন্টির (শ্রীমতী এমিলি শেংকল) সঙ্গে বসে আইসক্রীম খাচ্ছি—আইসক্রীমের কাঁচের পাত্রটি খুবই সুন্দর। খাওয়া থামিয়ে বাটি এডমায়ার করছি দেখে আন্টি বললেন—'এটা কবেকার জানো? সেই ১৯৩৪-এ যখন আংকলের (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে কার্লোভি ভারি যাই তখন কিনেছিলাম। একটা বাটি অসাবধানে ভেঙে গিয়েছিল, পরের বছর যখন আবার গেলাম তখন আর একটা কিনে নিলাম।

ভাবলাম এবার ইতিহাসের সন্ধানে বেরিয়েছি বলে কি সর্বত্রই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা! শেষ পর্যন্ত আইসক্রীমের পাত্রেও যে ইতিহাস! খাওয়ার পর কিচেন বেসিনে 'ড্রয়িং দি ডিশেস' করার সময় সাবধানে পাত্রগুলো ধুয়ে রাখলাম।

নীচে নামতে পাহাড়ের চূড়া থেকে কার্লসবাদ যে এতটা পথ কে জানত! নেতাজী অপূর্ব বনশোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—একথা ভেবে যথাসাধ্য স্পিরিটস উঁচু রাখার চেষ্টা করলেও শেষদিকে পথ হেঁটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। লজ্জাও করছিল—কই, চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে বোজেনা বা ডেনমার্কের মেয়ে বেনেডিকটে তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না! প্রায় নিজের দেশের সম্মান নিয়ে টানাটানি, তাই কষ্ট হলেও মুখ বুজে সহ্য করলাম। শেষ পর্যন্ত শহরে এসে নামলাম। বিকেল হয়েছে, লোকজন, বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। অন্তত সেদিন কার্লোভি ভারিতে আমিই একমাত্র শাড়িপরিহিতা—সকলে বিশেষভাবে নজর করছে। ছেলেমেয়েরা হাঁ করে চেয়ে আছে, পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখছে। বেনেডিকটে বললে, 'মজা দেখেছ, বড়রা একবার একপলক দেখে নিয়েই চেষ্টা করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—ছোটরা এত সব জানে না, ওরা তোমাকে অবাক বিস্ময়ে দেখছে।' একটি সুদৃশ্য রাশিয়ান চার্চের পাশে এলাম। ভিতরে ঢুকে একটু দেখলাম। রাশিয়ান চার্চের গম্বুজ অনেকটা মসজিদের মত।

বড় সুন্দর শহর এই কার্লসবাদ বা কার্লোভি ভারি। গাড়িতে উঠতে উঠতে পিছন ফিরে দেখলাম। ফিরতি পথে গাড়িতে বেনেডিকটে বললে, 'তুমি আর বোজেনা নিশ্চয় বাংলায় গল্প করতে চাও, করতে পারো, আমি কিছু মনে করব না।' কিন্ত সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সকলে মোটের উপর ক্লান্ত। কোন ভাষাতেই খুব একটা গল্প করার মত অবস্থা নয়। টাটরা গাড়ি একশ' ষোল কিলোমিটার স্পীডে চালিয়েও প্রাগে এসে পৌঁছুতে বেশ রাত্রি হল।

বেনেডিকটের ও কথা বলার একটা কারণ ছিল। প্রাগ শহরে পথেঘাটে ঘুরতে ফিরতে বেনেডিকটের উপস্থিতি বিস্মৃত হয়ে বোজেনা ও আমি মাঝে মাঝেই বাংলায় গল্প জুড়ে দিতাম। বেনেডিকটে হেসে বলত—আমি কিছু মনে করছি না। কেউ আমাদের ভাষা ভালবাসে দেখলে আমরা বাঙালীরা সহজেই অভিভূত হই। আমার সবচেয়ে আনন্দ হয়েছিল যেদিন বোজেনা তার শিশুপুত্রের গল্প আমাকে করেছিল।

কাজের সূত্রে বোজেনা থাকে প্রাগ শহরে। তিন বছরের শিশুপুত্র আছে মোরাভিয়াতে তার দাদু-দিদিমার কাছে। বোজেনা যখন ছুটিতে ছেলের কাছে যায়—ছোট্ট টমাস, তাকে মিষ্টি করে বাংলাতে বলে—'আমি তোমার সোনা।'

॥ চার ॥

একদিন সকালের দিকে একটু সময় করে শহর ঘুরে দেখতে বার হওয়া গেল। গাড়িতে না চড়ে পায়ে হেঁটে ও ট্রামে চড়ে ঘুরলাম। এতে শহরটা চেনা হয় বেশী. গত ক'দিন হুস্ করে গাড়িতে চলে যাওয়াতে তা হয়নি। এদিক সেদিক ঘুরে এসে হাজির হলাম সোজা প্রাগ কাস্‌ল-এ। আজ ট্যুরিস্টদের মত ভিতরে ঢুকে কাসলের ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বোজেনা যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তাছাড়া মাঝে মাঝে অটোমেটিক গাইডের সাহায্য নিচ্ছিলাম। অর্থাৎ ঠিক জায়গায় মুদ্রা ফেলে দিলে যন্ত্রের ভেতর থেকে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর সেই বিশেষ জায়গাটুকুর ইতিহাসের বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছিল। প্রাগ কাসেল-এর এপাশ সেপাশ থেকে সরু-গলি পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে—এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ। দু ধারে ছোট ছোট বাড়ি. মাঝে-মধ্যে হঠাৎ একটা বারোক ধাঁচের চার্চ—বেশ রোমান্টিক এমনি একটা গলি দিয়ে আমরা বেশ কিছু দূর গেলাম। তারপর অপেক্ষাকৃত চওড়া আর একটা গলি দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে এসে দেখি মালা স্ট্রানা এসে গেছি। সামনেই মস্ত বড় সেণ্ট নিকোলাস চার্চ। তার সামনে লোকজন, ভীড়। একটা গাড়ি থেকে শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা কনে ও কালো স্যুট পরা বর নেমে গীর্জায় ঢুকল। কম্যুনিস্ট দেশে চার্চ ম্যারেজ হয় আমার ধারণা ছিল না। শুনলাম হয়, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ মমপালসারি, তারপর যার ইচ্ছা অনুষ্ঠান করে বিয়ে করতে পারে। আমরা রবাহূত হয়ে গীর্জায় ঢুকে পড়লাম এবং অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখলাম।

সেদিন আমাদের ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউট ঘুরে দেখবার কথা' ডাঃ ক্রাসার ঘরে বসে প্রথমে ইনস্টিটিউটের সহকর্মীদের সংগে একদফা ঘরোয়া আলোচনা হল। ক্রাসা নিজের হাতে চা বানিয়ে সকলকে দিলেন। একটা কেটলিতে জল এল—খুবই সাদামাটা একটি টি-পট, আয়তনে এত ছোট যে দু' তিনবার ভিজিয়ে তবে সকলের এক কাপ করে হল। লাইব্রেরির কারুকার্যমণ্ডিত ভারী দরজার পাল্লা ছয় ইঞ্চি সাইজের চাবি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। শুনলাম এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের মত বই আছে। আমার চোখ বাংলা বইতে আটকে যাচ্ছিল। প্রথমেই চোখে পড়ে গেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী। রবীন্দ্রনাথ তো রয়েছেনই। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় আছেন, আছেন তারাশংকর। ওপাশে হিন্দির মধ্যে প্রেমচাঁদ।

ওপর তলায় চীনা বই-এর আলাদা লাইব্রেরি। বই আছে প্রায় ষাট হাজার। য়ুরোপে চীনা বইয়ের বৃহত্তম সংগ্রহ। নীচে রিডিং রুমে স্কলাররা বসে পড়াশুনা করছেন, পা টিপে টিপে ঘুরে দেখে নিলাম। বাড়িটা প্রাচীন, চকমিলানো ধরনের। মাঝে উঠোন, চারদিক ঘুরে বাড়িটা। শতাধিক কর্মী ইনস্টিটিউটে সর্বদা কাজ করেন। প'চাত্তর জনের মত বলা যেতে পারে ইনস্টিটিউটের স্কলার। এ ছাড়া কিন্তু লাইব্রেরিয়ান ও টেকনিক্যাল স্টাফ, জন দশেক পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র। ১৯২২ সালে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত, তবে রীতিমত কাজকর্ম শুরু হয় ১৯২৬ সাল থেকে। নাৎসী আমলে এমনিতে যেমন অ্যাকাডেমিক কাজ বাধাপ্রাপ্ত হল তেমনি অন্যদিকে একটা সুবিধাও হয়েছিল। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় নাৎসীরা ১৯৩১-এর নভেম্বরে বন্ধ করে দেয়। ফলে যারাই কিছু অ্যাকাডেমিক কাজ করতে চায় তারাই ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটে জড়ো হতো। অনেক দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটলেও অ্যাকাডেমিক কাজ বন্ধ হয়নি একদিনও। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রাগের চার্লস য়ুনিভার্সিটির

সঙ্গে যুক্ত। ডিরেকটর, ডেপুটি ডিরেকটর ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ডিপার্টমেণ্টের প্রধানরা রয়েছেন—যেমন আফ্রিকা ডিপার্টমেণ্ট বা পশ্চিম এশিয়া ডিপার্টমেণ্ট। নেতাজী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ডিপার্টমেণ্ট ও ইণ্ডলজি ডিপার্টমেণ্টের সদস্যরা। ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের তিনজন মনীষীর নাম করা হয় যাঁরা ভারত-চেকোশ্লোভাক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী ছিলেন। এঁরা হলেন—লেসনি, মরিজ উইলটারনিৎস এবং পারটোলড্।

ক্রাসা একটা ছোট ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার এক সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদের নিয়ে একটা দেড়তলা মত জায়গায় হাজির হলেন। সেখানে দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় একটা প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। আমরা ইনস্টিটিউটের বাড়ির পিছন দিকে এসে পড়েছি। এখানে ভলটাভা নদীর ওপর সেতু—চার্লস ব্রীজ, একমাত্র প্রাচীন সেতু। ব্যবহার হয় না, আগে যেমন ছিল রাখা আছে। অন্যান্য ব্রীজের আধুনিকীকরণ ঘটেছে—এর নয়। রাস্তার ওপারে একটা ছোট দোকানে ক্রাসা আমাদের নিয়ে ঢুকলেন—এটা একটা মশলার দোকান—সবরকম ভারতীয় মশলা পাওয়া যায় এবং সুন্দর প্রাচীন পাত্রে রাখা আছে। সমস্ত দোকানে একটা গন্ধ ভুরভুর করছে। এর পর আমরা নাপ্রেসটেক মিউজিয়াম দেখে ওলড টাউন স্কোয়ারে এসে পড়লাম। স্কোয়ারে টাউন হলের সামনে ট্যুরিস্টদের ভীড়—সবাই হাঁ করে টাউন হলের মাথায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—আধঘণ্টা অন্তর ঘড়ি বাজবে আর একসার পুতুল তালে তালে বেরিয়ে আসবে।

এরই মধ্যে একদিন ক্রাসা এসে উপস্থিত হলেন হোটেলে সন্ধ্যাবেলা। প্রাগ-এর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অপেরা দেখাতে নিয়ে যাবেন—'রুসালকা' (Rusalka) আমি তখন হোটেলের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে একটা শ্লোভাক পোশাক পরা পুতুল কিনবার চেষ্টা করছি। কাউণ্টারের চেক মেমসাহেব তখন এক জাপানী ভদ্রলোককে কি একটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। জাপানী ভাষা ছাড়া তিনি কিছু বলেন না, এদিকে চেক মহিলা ভাঙামত ইংরেজি বলেন। ক্রাসা এসে পড়াতে দুজনের মধ্যস্থতা করে তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করলেন তবে আমি এগোতে পারলাম। প্রাগ-এ এই একটা জিনিস আমাদের খুব ভাল লাগত—জিনিসপত্রের দাম সর্বত্র এক। আমরা যে উনিশতলা আধুনিক ফ্যাসনেবল হোটেলে আছি, সেখানে আমার শ্লোভাক পুতুলের বা একটা কাট গ্লাসের ফুলদানীর যা দাম হবে, শহরের যে কোন অঞ্চলে, যে কোন দোকানে একই দাম। আমাদের মত গ্র্যান্ড হোটেলে, নিউ মার্কেটে, পার্ক স্ট্রীটে, গড়িয়াহাটে পাঁচরকম হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

রুসালকা এক জলকুমারীর ট্র্যাজেডী। পৃথিবীর রাজপুত্রকে ভালবেসে সে সাধারণ রমণীরূপ পরিগ্রহ করল। জলদেবতার কোন কথাই সে শুনল না। যদিও এর জন্য তাকে মূল্য দিতে হল অনেক—মূক বধির যুবতী হয়ে পৃথিবীতে এল সে। রাজপুত্রের ক্ষণিকের ভালবাসা চরিতার্থ হয়ে যেতে সে অন্য এক রাজকন্যার প্রেমে আকৃষ্ট হল। প্রত্যাখ্যাতা রুসালকা ফিরে এল আপন ঘরে। কেমন করে রাজপুত্র আবার তার খোঁজে এল এবং তার সামনেই মৃত্যুবরণ করল—রুসালকার উপাখ্যান তারই করুণ কাহিনী।

প্রাগের কয়েকদিনের মধ্যে একটি দিন আমরা ছুটি চেয়ে নিলাম ডাঃ ক্রাসার কাছে। প্রাগের একটি চেক পরিবারের সঙ্গে একটি দিন অন্তত আমাদের কাটাতেই হবে—এরা কেজলার পরিবার। বহুকাল আগের কথা—ত্রিশের দশকের বার্লিন। বার্লিনের কুরফুসটেনডামের পথে হেঁটে চলেছে এক

চেক তরুণী। অপরদিক থেকে হেঁটে আসছেন এক ভারতীয়। চেক মেয়েটি পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একজন মানুষের চেহারায় এমন দিব্য বিভা হয়? নিশ্চয় ইনি কোন ভারতীয় দার্শনিক হবেন। আহা, আর কি কোনদিন দেখা হবে না? এমনি সব কথা মেয়েটির মনে জেগেছিল। তারপর কি আশ্চর্য, একদিন ঘটনাচক্রে এক আলোচনা সভায় গিয়ে তরুণী দেখল, প্রধান বক্তার আসনে সেই ভারতীয়। আর তিনি ঠিক দার্শনিক নন, রাজনৈতিক নেতা—নাম সুভাষচন্দ্র বসু। সেদিন যে সামান্য পরিচয় হল কালে তা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। নাৎসী আমলের মাঝামাঝি সময় মেয়েটি বার্লিন ছেড়ে আমেরিকা চলে যায়। সুভাষচন্দ্র সেই রকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বার্লিন আর তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আজ নেতাজীর ওপর একটি সুন্দর বই-এর রচয়িত্রী হিসেবে কিটি কুর্টির নাম অনেকের জানা। এখন তাঁর বয়স হয়েছে সত্তরের কোঠায়। প্রাগ-এ তাঁর মা-ভাই সমস্ত পরিবার রয়েছে। মিসেস কুর্টি সপ্তাহে অন্তত তিনখানা করে চিঠি লিখেছিলেন।—তোমরা প্রাহা যাচ্ছ, আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে—আমার মা-ভাইদের সঙ্গে অবশ্য দেখা করো।

নব্বুই বছরের বৃদ্ধা মিসেস কেজলার নিজে হোটেলে এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন—তাঁদের সঙ্গে একটা দিন কাটাতেই হবে। আচ্ছা, য়ুরোপে থাকলে লোকে বয়সটা কি ভাবে থামিয়ে রাখে? বৃদ্ধা বললে মিসেস কেজলার বিশেষ চটে যান। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে সারাদিনের মত হইচই করতে বেরিয়ে পড়লেন। আমি ওঁর জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেই বলেন—কিটি তোমাকে কি লিখেছে বল তো? আমাকে খুব বুড়ী বলে লিখেছে বুঝি! আমি তাড়াতাড়ি মাথা চুলকে বলি—না না, তা ঠিক নয়। কেজলার পরিবারের সঙ্গে আমরা স্লাপি চলে গেলাম। প্রাগের বাইরে বাঁধ আর হ্রদ। এরা যেমন সাধারণত করে—পাশেই সুন্দর হোটেল, খাবার জায়গা, কফি-বার-লঞ্চে করে হ্রদে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার কায়দা এরাই জানে। প্রাগ থেকে স্লাপি পর্যন্ত পুরো পথটা ভলটাভা নদীর তীর দিয়ে অপরূপ সুন্দর। মিসেস কেজলার মায়ের মত আদর যত্ন করতে লাগলেন। গরম লাগছে তবুও উলের জামাটা গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছেন—উঁহু, হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মায়ের বয়স কত? বললাম, সাতষট্টি। বললেন, বল কি; সো ইয়ং! কথাটা সেইদিনই কলকাতায় লিখে দিলাম।

কেজলার পরিবার আমাদের নিয়ে কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না। এদের আদর-যত্নের ঘটা দেখছি, আর ভাবছি কবে ১৯৩৩ সালে কুরফুসটেনডামের পথে সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে কিটি কুর্টির আকস্মিক যোগাযোগ! কে জানত তার এত বছর বাদে তারই জের টেনে কেজলারদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। প্রাগে যেন নিজেদের নিকট-আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে আছি মনে হল।

জীবনের সব ভাল জিনিসের মত প্রাগের দিনগুলিও এক সময় শেষ হল। প্রাগ এয়ারপোর্টে বোজেনা আমার ব্যাগে ছোট একটা কাট গ্লাসের উপহার ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললে—ভেঙে ফেলো না যেন, সাবধানে নিও। বোজেনাকে আমার গলার মালাটা খুলে দিলাম—ভারতীয় বন্ধুকে মনে রাখার জন্য। ডাঃ মিলোস্লাভ ক্রাসা হাত বাড়িয়ে দিলেন—শান্ত, ধীরভাবে হ্যান্ডশেক্ করে বিদায় চাইছেন—হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে পড়ে গেল। যখনই ক্রাসার সঙ্গে কথা বলেছি তখনই মনে হতো কার মত যেন চেনা-চেনা লাগে—কার কথা মনে পড়িয়ে দেয় প্রতিটি ভাবভঙ্গি—কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারি না। সেদিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে পড়ল। আমাদের মাস্টারমশাই সুপণ্ডিত অধ্যাপক তারকনাথ

সেনের ঠিক এই রকম দৃঢ় অথচ শান্ত ব্যক্তিত্ব ছিল আর ঠিক এই রকম নিরভিমান পাণ্ডিত্য।

॥ পাঁচ ॥

এ-যাত্রায় নানা দেশের নানারকম এরোপ্লেন চড়া হল। প্রাগ থেকে ইণ্টার-ফ্লুগ অর্থাৎ পূর্ব জার্মানীর এয়ার লাইনে পূর্ব বার্লিনের আকাশপথে রওনা হলাম। অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পর এবার জার্মানীতে প্রবেশ করব।

অস্ট্রিয়ার কথা আগে বলিনি। কারণ ভিয়েনাতে আমরা ঠিক ইতিহাস খুঁজতে যাইনি। ভিয়নাতে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক, সেখানে আণ্টি (শ্রীমতী এমিলি শেংকল্) রয়েছেন। অন্য একটা কারণ হল মেডিকেল কংগ্রেস। ভিয়েনাতে সে সময় আন্তর্জাতিক শিশুচিকিৎসক সম্মেলন হচ্ছিল হফবুর্গ প্যালেসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আট হাজার প্রতিনিধি জড়ো হয়েছেন। ডাঃ বসু যখন কংগ্রেস করছিলেন আমি তখন বাড়িতে বসে প্রাগের সেমিনারের কাগজপত্রে ফিনিসিং টাচ্ দিচ্ছিলাম।

আণ্টির ওখানে বসে কাগজপত্র দেখতে সুবিধা খুব। কারণ যখন যে বইয়ের দরকার সব হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি। একটা কাচের বই-এর আলমারিতে নেতাজীর নিজের লেখা এবং নেতাজীর সম্বন্ধে লেখা সব বই যত্ন করে গুছিয়ে রাখা আছে। তাছাড়া যখন যা চাই—কাগজ চাই, কার্বন পেপার চাই, টাইপরাইটার চাই, সবই আণ্টি সাপ্লাই করে যাচ্ছেন। একদিন টাইপ করতে করতে কাগজ ফুরিয়ে গেল, সেদিন রবিবার, দোকানপাট সব বন্ধ। মুশকিলে পড়ে গেলাম। আণ্টি বললেন, দাঁড়াও দেখি। তারপর এ-দেরাজ সে-দেরাজ ঘাঁটাঘাটি করে হাজির করলেন এক গোছা কাগজ। সব সেই '৪২ সালের বার্লিনের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের কাগজ। আমি তো এ কাগজ ব্যবহার করব, না সঙ্গে করে কলকাতার নেতাজী মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে যাব, ঠিক করে উঠতে পারলাম না। একদিন একটা ইংরেজী বানান নিয়ে খটকা লাগল। আলমারিতে অন্যান্য বই-এর মধ্যে একটা ইংরেজী অভিধান। খুলতেই প্রথম পাতায় চোখে পড়ল আণ্টির নাম লেখা রয়েছে, হাতের লেখাটা নেতাজীর। শুনলাম বহুকাল আগে একবার ডিকশনারিটা ওঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

কি জানি কেন ভিয়েনাতে খুব শান্তিতে কাজ করতে পারছিলাম। কলকাতা এত প্রিয় শহর তবু এক এক সময় যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, নার্ভের ওপর চাপ পড়ে যায় অত্যধিক। সেপ্টেম্বর মাসের ভিয়েনা তখনো সবুজ, নীল আকাশ আর ঝলমলে রোদ্দুর। গরম কাপড় ঠিক দরকার হয় না অথচ শীত আসি আসি করছে। ভিয়েনার সমৃদ্ধি যেন আগের চেয়ে বেড়েছে মনে হল। শহরের ভিতরে দোকানপাট ঝলমল করছে। মারিয়া হিলফার স্ট্রাসে—আমরা যাকে ভিয়েনার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বলি—অথবা কারণ্টনার স্ট্রাসে অপেক্ষাকৃত অভিজাত দোকানপাটের এলাকা ধরে হাঁটলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মারিয়া হিলফার স্ট্রাসের ওপর তখন "ইণ্ডিয়া বাজার" খুলেছে। খুব গলা-কাটা দামে ইণ্ডিয়ান জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

ভিয়েনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। ইতিহাস খুঁজতে চাইলে ভিয়েনাতে অবশ্য যথেষ্ট মালমশলা পাওয়া যায়। অনেককিছু ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। '৩৩ সালে অসুস্থ হয়ে সেই যে সুভাষচন্দ্র ভিয়েনাতে এসেছিলেন, তারপর

প্রাগে সুভাষচন্দ্র (১৯৩৩)

প্রাগ ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের নেতাজী সেমিনার; উপবিষ্ট ডাঃ ক্রাসা ডান দিক থেকে তৃতীয়

কার্লোভি ভারিতে সুভাষচন্দ্র (১৯৩৪)

Karlsbad.
1. 11. 34

My dear Professor,

I am leaving for Vienna tomorrow (Friday) morning and shall ~~~~~ break journey at Prague for a few hours. I arrive in the afternoon and again take the night train for Vienna. If you have time, I would like to meet you in the late afternoon or in the evening. My train is at 10 P.M. and any time after 6 P.M. would suit me. I am writing to Mr Nambiar to fix up an appointment with you.

Please do not make any arrangements for dinner, as you very kindly do whenever I am in Prague. I have some other engagements and moreover I am eating something very light in the evening now-a-days. I shall be glad to have a talk with you, when we could discuss matters concerning the Indo-Czechoslovak
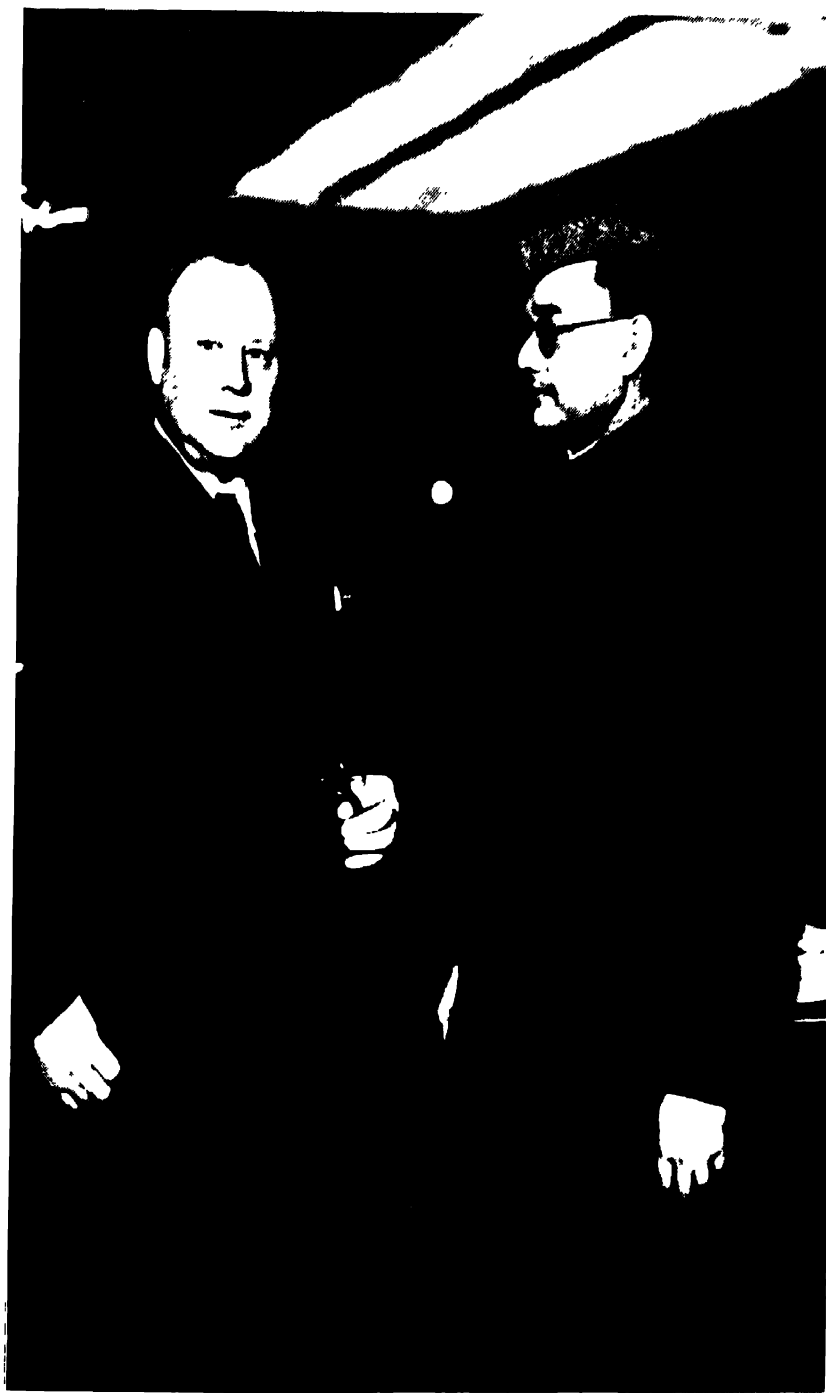
ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের দপ্তরে রক্ষিত ডাঃ লেসনিকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি

অধ্যাপক ডাঃ লেসনি ও সংকলয়িতা

[illegible] ভারির এই বাড়ীতে ১৯৩৪ সালে নেতাজী বাস করতেন

ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটের ভিজিটর বই এর পাতায় সুভাষচন্দ্রের নাম সই

আজাদ হিন্দ রেডিওর বালকৃষ্ণ শর্মার সঙ্গে হেলা শর্মা ও শ্রীমতী এমি

জার্মানীতে নেতাজীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডাঃ লোথার ফ্রাংক এর সঙ্গে লেখিকা

বার্লিন ১৯৩৩, একটি সভায় বক্তৃতারত সুভাষচন্দ্র
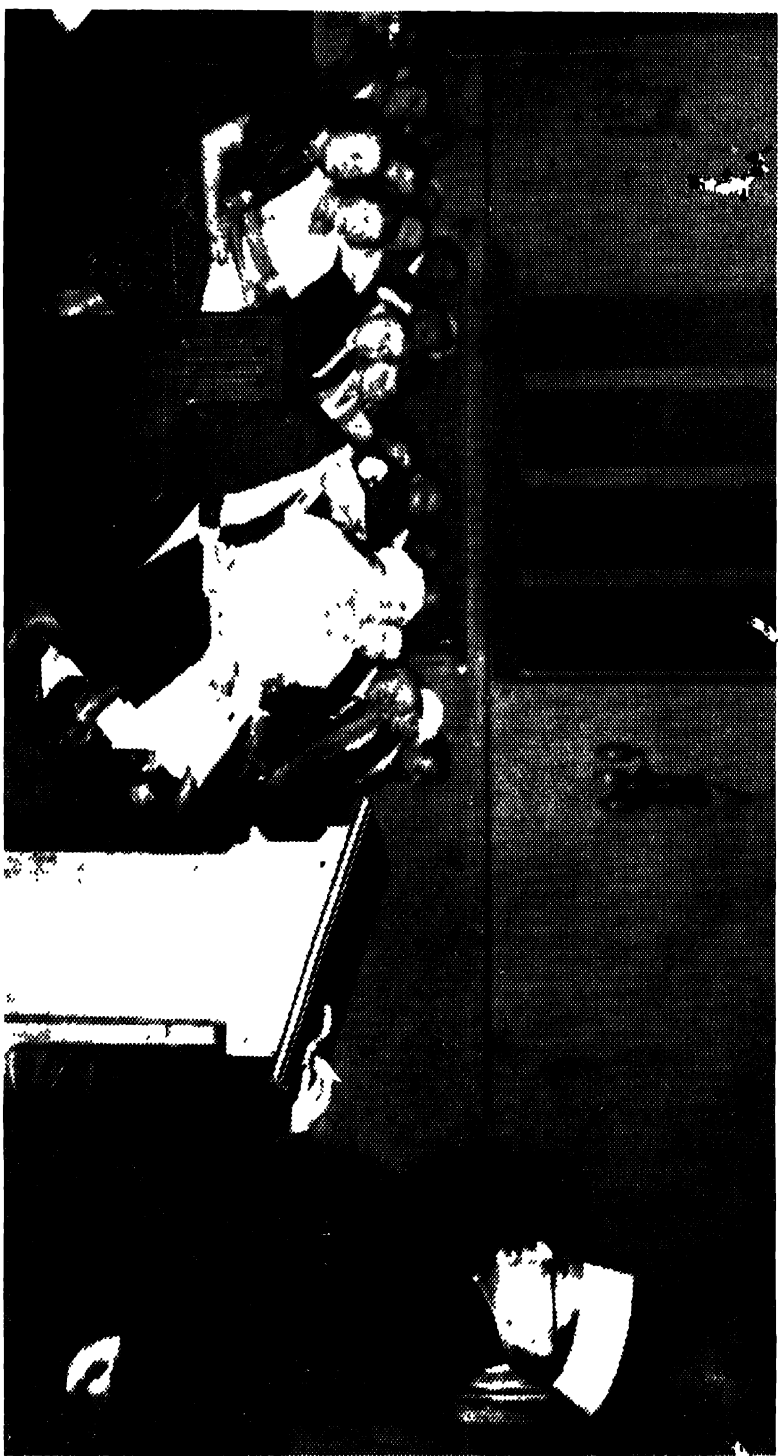
'৩৪ থেকে '৩৮ সালের মধ্যে ফিরে এসেছেন বহুবার। আর যুদ্ধ চলার সময়েও বার্লিন থেকে ভিয়েনা এসেছেন বেশ কয়েকবার।

ভিয়েনাতে অন্যান্যদের মধ্যে লেখক রেনে ফুলপ-মিলার ও শ্রীমতী হেডি ফুলপ-মিলার ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ও ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। শ্রীমতী ফুলপ-মিলারের সঙ্গে নেতাজীর পত্রালাপ হয়েছিল অনেক। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধের শেষ সময়ে ভিয়েনার রুশ অধিকৃত অঞ্চলে থাকার সময় সমস্ত চিঠিপত্র খোয়া যায়। ফটোগ্রাফ কিছু বেঁচে গিয়েছিল। সেগুলি শ্রীমতী ফুলপ-মিলার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর জন্য পাঠিয়ে দেন।

ভিয়েনার আর একটি দম্পতি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুণ্ঠ সমর্থক ও নেতাজীর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এরা হলেন ডাঃ ফেতার (Vetter) ও শ্রীমতী নাওমি ফেতার। ডাঃ ফেতার ভিয়েনার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। শ্রীমতী নাওমি ফেতার বহু সভাসমিতিতে সুভাষচন্দ্রের ইনটারপ্রিটার হিসেবে কাজ করেছেন। শ্রীমতী ফেতারকে লেখা সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় পত্রগুচ্ছ রিসার্চ ব্যুরোর দপ্তরের একটি অমূল্য সম্পদ।

আগের বার ভিয়েনায় এই দুই ভিয়েনিজ বন্ধুর সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছিল। সমাদর পেয়েছিলাম খুব। এরা একটু ক্ষোভ প্রকাশও করেছিলেন যে ভারতবর্ষের দুঃখের দিনে এরা ছিলেন আমাদের সংগ্রামের সাথী, অথচ স্বাধীনতার পর আমাদের দূতাবাসের কাছে এরা বেশী পাত্তা পান না। কোন অনুষ্ঠানে ভদ্রতা করে একটা নেমন্তন্ন কার্ডও কেউ পাঠায় না।

এবার ভিয়েনায় এসে যখন শুনলাম শ্রীমতী ফুলপ-মিলার মারা গিয়েছেন এবং শ্রীমতী ফেতারের কোন খোঁজ নেই, খুব সম্ভবত উনিও বেঁচে নেই, তখন খুবই দুঃখিত হলাম। ভিয়েনিজ বন্ধুদের ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসাই সুভাষচন্দ্রকে ভিয়েনার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধেছিল।

এস্ এস্ ওয়াশিংটন জাহাজ থেকে '৩৬ সালে শ্রীমতী ফেতারকে লেখা একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—আপনাদের সহৃদয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা কেমন করে জানাব জানি না। তারপর বলছেন-people have wondered why I have spent so much of my time in Vienna during the last three years—but I do not wonder.

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। আমরা চাই বা না-চাই এ যাত্রা ইতিহাস আমাদের ছাড়বে না বলে মনে হল। নয়ত শর্মার সঙ্গে ভিয়েনাতে দেখা হবে এটা আমরা প্রত্যাশাই করিনি। বালকৃষ্ণ শর্মার নাম যদি নাও শুনে থাকেন, ওঁর কণ্ঠস্বর শুনলে অনেক বয়স্ক বাঙালী ও ভারতীয়ের মনে হবে, এ কণ্ঠস্বর এত পরিচিত কেন! যুদ্ধের সময় বার্লিন থেকে প্রচারিত আজাদ হিন্দ রেডিও যাঁরাই শুনেছেন—Azad Hind Calling, Azad Hind Calling. This is the voice of Azad Hind, the voice of Free India— বালকৃষ্ণ শর্মার কণ্ঠস্বর তাঁদের নিতান্ত পরিচিত হতে বাধ্য।

ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে গেলে দু' ধরনের উৎস পাওয়া যেতে পারে। দলিলপত্র, ডকুমেণ্ট—সেও ঘাঁটতে খুব ভাল লাগে, পড়তে পড়তে সিনেমার পর্দার মত চোখে ভাসে অতীত। কিন্তু আরো ভাল লাগে এমন কোন ব্যক্তির যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যিনি প্রত্যক্ষদর্শী, যাঁর মুখ থেকে সোজাসুজি শোনা যাবে অতীতের কাহিনী। এবারের সফরে তেমন অনেকের দেখা পেয়েছিলাম—ভিয়েনাতে শর্মা

তাঁদের মধ্যে প্রথম। পরে দেখা হল লোথার ফ্রাংক, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ, এ সি এন নাম্বিয়ার, প্রফেসর অলসওয়ার্থ, ধাওয়ান, এমন কি শেষ পর্যন্ত ওটেন সাহেবের সঙ্গেও।

শর্মা ও তাঁর ভিয়েনিজ স্ত্রী হেলা খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হল। চমৎকার দিন। ওরা বললে, চলো, চলো, কালেনবার্গ যাওয়া যাক। পাহাড়ের চূড়ায় কালেনবার্গ পৌঁছে মনে হল সমস্ত ভিয়েনা শহর সেদিন সেখানে এসে পড়েছে। রং-বেরং-এর পোশাকের সমারোহ। শীতকালে ওভারকোটের তলায় য়ুরোপীয় নরনারীর সব রং চাপা পড়ে থাকে। শরৎকালে সুন্দর সূর্যালোকে রং-এর হোলি খেলা চলছে মনে হল। ভিয়েনার মেয়েরা অস্ট্রিয়ান ন্যাশনাল ড্রেস পরে এসেছে। ভিতরে সাদা ব্লাউজ, তার ওপর হাত-কাটা রঙীন ফ্রক, জামার ওপরটা ও স্কার্টের দিকটা দু' রঙের, সামনে আবার সাদার ওপর কারুকার্য করা অ্যাপ্রন বড় সুন্দর লাগছে। ফিরে ফিরে দেখছি, তাই আণ্টি বললেন, নিজের জন্য একটা কিনবে ভাবছ নাকি! পাহাড়ের পথে বাজনা বাজিয়ে এক বুড়ো গান ধরেছে—পপুলার কি এক সুর। কালেনবার্গ থেকে পাহাড়ের নীচে ভিয়েনা শহর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সুন্দর, ডানিয়ুব বয়ে যাচ্ছে একপাশে।

ভিড় কম হতে পারে মনে করে একটু ঘুরে লিওপোল্ডসবার্গ যাওয়া হল। সব জায়গাতেই লোক গিজগিজ করছে। কোন টেবিলে খালি চেয়ার নেই একটাও। সবাই এক কাপ কফি বা এক মগ ওয়াইন নিয়ে বসে আছে। অতএব আমরা নেমে এলাম পাহাড় থেকে নীচে গ্রীনসিংগ ভিলেজে। ছোটখাটো সুন্দর ওয়াইন ভিলেজ। গাড়ি থামিয়ে একটা ট্যাভার্নে ঢোকা হল। ঢুকেই পিছনদিকে বাগান জুড়ে চেয়ার-টেবিল পাতা, মাথার ওপর ও চারপাশে আঙুর লতা। রকমারি চীজ, রকমারি মাংস এবং বিরাট সাইজের মগ ভরতি সাদা ও লাল ওয়াইন নিয়ে বসে আছে টেবিল ঘিরে সবাই। টেবিলে টেবিলে ঘুরে অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে গান ধরেছে দু'জন গায়ক। কোন মতে একটা টেবিল খালি পাওয়া গেল।

কথায় কথায় গল্প জমে উঠল খুব। শর্মা ও আণ্টি পুরোন দিনের কথা বলতে বলতে নোট মেলাতে লাগলেন পরস্পর। বালকৃষ্ণ শর্মার (হেলা ও আণ্টি সস্নেহে ডাকে 'কৃষ') চেহারা ও কথাবার্তা খুব সম্ভ্রান্ত ও অমায়িক। আণ্টি বলেন—তাও তো তোমরা তরুণ বয়সে 'কৃষ'কে দেখোনি। উনি প্রথম দেখেন ১৯৩৪-৩৫ সালে—তখন নেতাজীর প্রেরণায় ভিয়েনাতে অস্ট্রিয়ান-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। তারই একটা মিটিং ব্রিস্টল হোটেলে হচ্ছে। ঢুকে দেখেন একপাশে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে খুব হ্যান্ডসাম চেহারার একটি ভারতীয় যুবক দাঁড়িয়ে আছে। আলাপ হল—সে-ই শর্মা। নিজের স্তুতি শুনে শর্মা লজ্জিতভাবে হাসলেন। দেশের বাইরে নেতাজী যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপর্ব প্রস্তুত করছিলেন তখন তাঁকে রকমারি মাল-মশলা নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল—সব সময় উৎকৃষ্ট জিনিস পেয়েছিলেন তাও নয়। কিন্তু দৈবাৎ দুটি-চারটি খাঁটি মানুষ পেয়ে গিয়েছিলেন। য়ুরোপের সংগঠনে নাম্বিয়ার বা শর্মা এই জাতের। আজও তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য রয়েছে নেতাজীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি। শর্মাকে ধরলাম—একবার বলুন না সেই লাইনগুলো যা রোজ আজাদ হিন্দ রেডিওতে শুরুতে বলতেন। প্রথমে বললেন, ভুলে গেছি। হেলা উৎসাহ দিয়ে বললে—কৃষ, চেষ্টা করো, নিশ্চয় ভুলে যাওনি। একটু থেমে ঠেকে ঠেকে পুরোটা না হলেও অনেকখানিই বলে গেলেন—

—To arms, to arms, the heavens ring with the clarion

call to freedom's fray...... আর শেষ হতো এই কথা বলে— our cause is Just.

বার্লিনে আজাদ হিন্দ রেডিওতে শর্মা যখন কাজ শুরু করেন তখন দুটি ভাষায় প্রচার হতো। পরে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় দশটি ভাষায়। প্রচারের কত কায়দা-কানুন নেতাজী নিজ হাতে শিখিয়ে দিতেন। ওদের লোকবল সামান্য। এদিকে রোজ রেডিওতে শর্মা বলেন—আমাদের লন্ডন প্রতিনিধি খবর পাঠিয়েছেন ইত্যাদি—অথবা আমাদের প্যারিস করেসপনডেন্ট রিপোর্ট দিচ্ছেন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন লোক লন্ডনে বা প্যারিসে নেই। প্রথম দিকে নেতাজী স্বয়ং খবর কাগজ ও অন্যান্য ইনটেলিজেনস্ রিপোর্ট স্টাডি করে এগুলো তৈরী করে দিতেন। "এরপর এ কাজে আমাদের হাত পেকে গেল", শর্মা বললেন—"এই সব রিপোর্ট যে কত নিখুঁত হতো এবং শত্রুপক্ষ কতখানি বিভ্রান্ত হতো সেটা পরে নিজে বিশেষ বিপদে পড়ে জানতে পারি।" যুদ্ধের পর যখন ইংরেজদের হাতে শর্মা বন্দী তখন জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভয়ানক জেরা শুরু হল, বলো তোমাদের লন্ডন প্রতিনিধি কে ছিল, প্যারিস প্রতিনিধির নাম কি? সত্যি কথাই বলছেন যে এমন লোক কেউ ছিল না—কিন্তু কে বিশ্বাস করবে!

অবশ্য সাধারণভাবে শর্মা ব্রিটিশদের হাতে বন্দী অবস্থায় খুব খারাপ ব্যবহার পাননি। যে ব্রিটিশ অফিসারের হাতে তিনি বন্দী হলেন তিনি প্রথমেই বললেন—ওয়েল শর্মা, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তবে তুমি যা করেছ আমিও ঠিক তাই করতাম। এই ব্রিটিশ অফিসারের নীচেই যে ভারতীয় অফিসার ছিলেন—ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির সেই অফিসারটির চেয়ে শর্মা ও অন্যান্য আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বন্দীদের ইংরেজ অফিসারটি সম্মানের চোখে দেখতেন। একই কথা পরে নাম্বিয়ারের কাছেও শুনেছিলাম। সূর্যের চেয়ে তপ্ত বালির আঁচ বেশী। ব্রিটিশ অফিসারের চাইতে জনৈক ভারতীয় অফিসার অনেক সময় বেশী লম্ফ-ঝম্প করতেন। স্বাধীনতার পর নাম্বিয়ার বিদেশে আমাদের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন। একবার কার্যোপলক্ষে দিল্লী এসে নেহরুর সঙ্গে রয়েছেন, একদিন শুনলেন একজন আর্মি অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এসে দেখেন, এ যে সেই ভারতীয় অফিসার, যার চার্জে উনি ছিলেন। নেহরুর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা এবং বর্তমান উচ্চপদ দেখে অফিসারটি একটু শঙ্কিতবোধ করেছিলেন, কি জানি নাম্বিয়ার পূর্বেকার খারাপ ব্যবহারের কথা স্মরণ রেখেছেন কিনা! নাম্বিয়ার তাকে আশ্বস্ত করলেন।

শর্মার বন্দীজীবন অসহনীয় হয়ে ওঠেনি আর একটি কারণে—তাঁর বন্দী অবস্থায় দুই সঙ্গী ছিলেন হবিবুর রহমান (ইনি পূর্ব-এশিয়ার হবিবুর রহমান যিনি সাইগন থেকে বিমানে নেতাজীর সঙ্গী ছিলেন তিনি নন) এবং রামচন্দ্র, যার অপর দুই নাম হল ফিশার ও অগেহানন্দ। এরকম অপূর্ব দুজন সঙ্গী পেলে সময় ভাল কাটবারই কথা। ফিশার বা রামচন্দ্র বা পরবর্তীকালের সন্ন্যাসী অগেহানন্দ জাতিতে অস্ট্রিয়ান। কিন্তু সে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে। বলে, ভারতবর্ষকে ও'র মাতৃভূমি রূপে অ্যাডপট্ করেছে। অতএব এই স্বেচ্ছাবৃতো মাতৃভূমির সেবা করবার জন্য এক রকম জোর করে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে ঢুকে পড়ে কিছু কাজের ভার নিয়েছিল। ইংরেজদের হাতে বন্দী হবার পরও সে সমানে দাবি করতে লাগল যে সে ভারতীয়। ব্রিটিশ অফিসারদের সে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। তার অনর্গল হিন্দি কথা শুনে ব্রিটিশরাও বিভ্রান্ত। যদি সে তার সত্য পরিচয় দেয় তবে বন্দী হিসেবে সে অনেক সুবিধা ও ভাল ব্যবহার পেতে পারে। শর্মারা

তাকে অনেক বোঝায় কিন্তু সে কিছুতেই মানবে না। এদিকে ভারতীয় বন্দীরা যা খাদ্য পায়, রামচন্দ্রের দশাসই চেহারা, তাতে তার কিছু হয় না। সব বন্দীরা তাদের খাবার থেকে একটু করে দিয়ে রামচন্দ্রের জীবনরক্ষার চেষ্টা করে। তবু দেখতে দেখতে তার ওজন কমে অর্ধেক হয়ে গেল। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত তার সত্য পরিচয় পাওয়া গেল। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয় অগেহানন্দ।

হবিবুর রহমান আর এক চরিত্র, অত্যন্ত করিৎকর্মা। সিগ্রেট চাই, আর কিছু নিষিদ্ধ জিনিস—জেলখানায় হবিবুর রহমান ঠিক এনে হাজির করবে। নাম্বিয়ারকে একবার বললে, ডিম চাই?—ডিম! কোথায় পাব? নাম্বিয়ার তো অবাক—সে তোমার ভাবতে হবে না। এর পর থেকে রোজ ডিম সাপ্লাই চলল। রহস্যটা পরে জানা গেল। একজন পাদ্রী রোজ জেলখানায় আসতেন বন্দীদের পরলোকের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। হবিবুর রহমান এমন ভাব করতে লাগলেন যে, খৃষ্টধর্মের প্রতি এবং বিশেষ করে এই পাদ্রী সাহেবের উপদেশাবলীর প্রতি উনি বিশেষ রকম আকৃষ্ট হয়েছেন। শরীর খারাপের অছিলায় পাদ্রী সাহেবকে বলে ডবল ডিমের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

গল্প শুনে আণ্টি হাসলেন। বললেন, জাস্ট লাইক হিম। ও এই রকমই ছিল। যুদ্ধের পর য়ুরোপে থেকে গিয়ে জাঁকিয়ে ব্যবসা করেছিল হবিব। মাত্র অল্প দিন আগে প্রচুর সম্পত্তি রেখে ভেনিসে মারা গেছে সে। ভেনিস থেকে ওর জার্মান স্ত্রী দুঃসংবাদ দিয়ে আণ্টিকে টেলিফোন করেন। আণ্টির মনে হল হবিব একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য এককালে যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন। ভিয়েনার দূতাবাসে খবরটা দিয়ে উনি অনুরোধ করেন, ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষে ওর শেষ কাজের সময় কারো উপস্থিত থাকা উচিত। দূতাবাসের একজন অফিসার তৎক্ষণাৎ হবিবের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে চলে যান।

যুদ্ধের শেষে শ্রীমতী এর্মিলির অ্যাপার্টমেণ্টেও ব্রিটিশ আর্মি অফিসারদের পদ-ধূলি পড়েছিল। প্রথমবার ও'র উপস্থিতিতেই সব কিছু সার্চ করে যায়। আর একবার ও'র অনুপস্থিতিতে এসে ডেস্ক থেকে ও'র কাছে লেখা নেতাজীর কয়েকখানা চিঠি তুলে নিয়ে চলে যায়। তার মধ্যে ছিল পূর্ব এশিয়া থেকে লেখা চিঠি। বলে গিয়েছিল ফেরত দিয়ে যাবে, অবশ্য আজও তা পাওয়া যায়নি।

গ্রিনসিংগ ভিলেজের সেই ট্যাভার্নে বাইরের বাগানে আর বসা যাচ্ছে না। অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। সেদিনকার মত সভাভঙ্গ। ঠিক হল শর্মাদের ওখানে আমরা একদিন লাঞ্চ খাব আর বার্লিনের আরো গল্পও শোনা যাবে সেদিন।

ভিয়েনার অ্যাফ্রো-এশিয়ান ইনস্টিটিউটে নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবি দেখাবার ব্যবস্থা ভারতীয় দূতাবাস করেছিলেন। আমরা অবশ্য এর আগেই একদিন অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির চমৎকার হল-এ বন্ধুবর মিঃ মুখার্জির উৎসাহে ছবিটি দেখতে পেরেছিলাম। অ্যাফ্রো-এশিয়ান ইনস্টিটিউটে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে আর একদিন সন্ধ্যায় কিছু আলোচনা ও ফিলম্ শো হল। আলোচনায় দূতাবাসের তরফে মিঃ ফ্যাবিয়ান, শর্মা, রয়টারের কৃষ্ণমূর্তি ও ডাঃ বসু অংশ নিলেন। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ভারতীয়র চাইতে মনে হল সংখ্যায় বাংলাদেশের ছেলেরাই বেশী ছিল। ভিয়েনাতে কার্যসূত্রে যে সব বাংলাদেশের ছেলেরা আছে আগেই একদিন তারা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস—এরা অত্যন্ত দুঃখ ও মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যথাসাধ্য সাহায্য
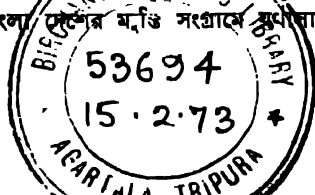
করার চেষ্টা করছে। "Why Bangla Desh" নামে একটি সুলিখিত প্যাম-ফ্লেট আমাদের হাতে ওরা দিল। একজন বললে, আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন কি-ই বা করতে পারি! ওদের বলা হল—শর্মাকে জিজ্ঞাসা করো ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টার যখন বার্লিনে গঠিত হয় ওরা ক'জন ছিল?

আন্টি মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্য বলতে ভালবাসেন। বললেন, "কিছু মনে করো না, একটা কথা বলি। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষ থেকে যে সব ছাত্র ও তরুণরা য়ুরোপে আসত তাদের কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাদের জাতই ছিল আলাদা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, স্বার্থলেশহীন, সব কাজে আন্তরিক। তারপর তথাকথিত স্বাধীনতার পর যারা আসতে লাগল দিনে-দিনে তাদের মান শুধু নেমে যেতেই দেখলাম। আজ এই যে তোমরা একটা বিরাট ঘা খেয়েছ, ভালই হয়েছে। আবার আশা হচ্ছে কিছু সৎ, সাহসী, দেশের জন্য সর্বস্ব দিতে চায় এমন তরুণের দেখা পাব।"

শর্মাদের সঙ্গে মাঝে ক'দিন দেখা হল না। আমরা একদিন ভিয়েনার বাইরে বাডেনে চলে গিয়েছিলাম। বাডেনে কিছু ভিয়েনিজ আত্মীয় কুটুম্ব আছেন, কিছু পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন করার ছিল।

শর্মাদের সঙ্গে লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে ওদের ফ্লোরিয়ানিগাসের বাড়িতে হাজির হলাম একদিন।

হেলা ভিয়েনা স্নিৎশেল রেঁধেছিল। হেলার অমন চমৎকার রান্নাবান্না সত্ত্বেও আমাদের মন পড়েছিল শর্মার গল্পের ওপর। কি করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম রিক্রুট সংগ্রহ করা হতো সেদিন সেই গল্প শুনছিলাম। না, কাউকে কোনদিন জোর করে আজাদ হিন্দ ফৌজে ঢোকানো হয়নি। এরকম কথা যদি কেউ বলে তা মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছু নয়। নাম্বিয়ারও এ কথা সমর্থন করেছিলেন। নাম্বিয়ার বললেন, দশ হাজার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে মাত্র তিন হাজার য়ুরোপের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। জোর করে করতে চাইলে এর চাইতে ঢের বেশী করা যেত। শর্মা বললেন যে, নেতাজী এইসব যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কথা বলতেন, বোঝাতেন। ওদের মধ্যে একটা আনুগত্যের দ্বন্দ্ব অবশ্যই দেখা দিত। "নিমক্" কথাটা খুব বেশী শুনতাম। পুরুষানুক্রমে ব্রিটিশ আর্মিতে আছে এমন সব ভারতীয় সৈন্যরা বলত—'নিমক' খেয়েছি, কেমন করে আনুগত্যের শপথ ভাঙব? ওদের নেতাজী বোঝাতেন—কোন আনুগত্য বড় হওয়া উচিত। তোমাদের দেশের অন্নজলে তোমরা পুষ্ট। তার কি কোনই দাম নেই? তোমার স্বদেশের চাইতে বিদেশী প্রভুর কাছে আনুগত্যের শপথই কি বড় হবে?

একদিনের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা শর্মা প্রায়ই বলতেন। নেতাজী অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সেদিন বেশ কিছু সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে। শর্মারা সকলেই খুশি। কিন্তু একটা কারণে মনের মধ্যে খচখচ্ করছে সবাইর। একটা পুরো মারাঠী রেজিমেন্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মারাঠীরা অত্যন্ত দেশ-প্রেমিক এ কথা সবাই জানে। নেতাজীর উদ্দীপনাময় ভাষণের পর এদের কাছ থেকে কোনই সাড়া পাওয়া যাবে না এটা ঠিক আশা করা যায়নি। পরদিন সকালে মারাঠী সেনাদলের কম্যানডার নেতাজীর সগে দেখা করে কি বলতে এলেন। বাইরে এসে সবাই দেখেন পুরো দলটি মিলিটারি ফরমেশন্ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নেতাজীর কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে এসেছে। খাপছাড়াভাবে দশজন কুড়িজনের দলে তারা কিছু করবে না বলেই কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

অকস্মাৎ "ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য দলগুলি কেউ বা "আল্লাহো আকবর", কেউ বা "হর হর মহাদেও", কেউ বা "সৎশ্রী অকাল" ধ্বনি তুলল। তারপর সকলে মিলিত কণ্ঠে এই বিভিন্ন ধ্বনি দিতে লাগল। নেতাজী ও উপস্থিত অফিসাররা অভিভূত, অনেকের চোখে জল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই আজাদ হিন্দ ফৌজের সময়ই একবার ধর্ম ও আঞ্চলিকতার বিভেদ সবাই ভুলে গিয়েছিল। "জয় হিন্দ" ধ্বনি শুধু মুখের কথা ছিল না। আমরা ভারতীয়, ভারতবর্ষ আমার দেশ—এই ছিল একমাত্র পরিচয়।

সকলেই এখন জানেন যে, হিটলারের গভর্মেণ্টের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের স্বীকৃতি বা রেকগনিশন পেতে নেতাজীকে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে চটাবার কোনই বাসনা হিটলারের ছিল না। তাছাড়া স্বীকৃতি দেবার আগে ওদেরও তো ভাবতে হবে। নেতাজী তো সহজ মানুষ নন। এমন আবদার ধরেন যা নাৎসী রাজত্বে একজন জার্মান চিন্তাও করতে পারে না। বার্লিনের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে যা কিছু প্রচার হবে তা কোনমতেই সেন্সার করা চলবে না—এই জিদ ধরে থেকে শেষ পর্যন্ত নেতাজীই জিতলেন। প্রচারিত হয়ে যাবার পর নিয়মরক্ষা হিসেবে স্ক্রিপট্গুলি জার্মান গভর্মেণ্টের কাছে পাঠানো হতো। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে বসেও আমরা বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির চাপের কাছে কত সময় নতি স্বীকার করতে বাধ্য হই। ভাবতে অবাক লাগে, পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক সুভাষচন্দ্র ওদেরই মাটিতে বসে কেমন করে হিটলার, মুসোলিনি বা তোজোর মত ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনায়কদের কাছে নতি স্বীকার করা দূরে থাক, নিজের অধিকার আদায় করে ছাড়তেন। বার্লিনের ফ্রি-ইণ্ডিয়া সেণ্টারের জন্য জার্মান সরকার যে অর্থসাহায্য করতেন নেতাজী তা ধার হিসেবে নিতেন। কথা ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ সে ধার পরিশোধ করবে। নাম্বিয়ার বলেছিলেন পূর্ব এশিয়াতে যখন ভারতীয় অর্থে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হল তখন নেতাজী ধার শোধ হিসেবে কিছু টাকা—পঞ্চাশ হাজার ইয়েন মত—ফেরত পাঠালেন। টাকার অংক যত সামান্যই হোক না কেন, এই ঘটনাতে আমাদের আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় আছে। জার্মানদের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারতাম।

সরকারী স্বীকৃতি বা রেকগনিশন তখনো হয়নি, নেতাজী হামবুর্গ পরিদর্শনে গেলেন। শর্মা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই হামবুর্গ পরিদর্শন শর্মার বিশেষ ভাবে মনে আছে। কারণ সেই প্রথম নেতাজীকে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। সামনে মোটর সাইকেলের সার নেতাজীর মোটরকেড চলেছে। পথের দু ধারে ভারতীয় চরকা-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা ও নাৎসী জার্মানীর পতাকা এই প্রথম পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে। সম্বর্ধনা সভায় ভারতীয় জাতীয় সংগীত হিসেবে 'জনগণ মন' অর্কেস্ট্রাতে বেজেছিল। এত ভাল অর্কেস্ট্রেশন, 'জনগণমন'র হতে পারে শর্মা জানতেন না। সভায় নেতাজীর ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শর্মার কাছে হামবুর্গের কথা যা শুনলাম, পরে যখন হামবুর্গ গিয়ে পেঁৗছলাম, রাটহাউসের অর্থাৎ পৌরসভার দলিলপত্রে সবই আবার দেখলাম। 'জনগণ'র জার্মান অনুবাদ রয়েছে, অর্কেস্ট্রাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল তার বিল, মায় কি খাওয়া হয়েছিল তার মেনু।

১৯৪৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী বার্লিনের ভারতীয়েরা নেতাজীর জন্মোৎসব পালন করলেন। ও'রা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে সেখানা নেতাজীকে উপহার দিলেন। জন্মোৎসবের আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে কে যেন সামনের

বছর এই দিনে কি করা যাবে এমনি কি বলছিল। নেতাজী হঠাৎ বললেন—সামনের জন্মদিনে আমি তোমাদের মধ্যে না-ও থাকতে পারি। ধক্ করে উঠল শর্মার বুকের মধ্যে—তবে কি নেতাজী দূরে কোথাও যাবার কথা ভাবছেন? নেতাজী ওদের মধ্যে থাকবেন না এ কথা যে ভাবাই যায় না। শর্মা বললেন, "তখন তো জানতাম না, সব প্ল্যান হয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন পর ৮ই ফেব্রুয়ারী উনি জাপানের পথে যাত্রা করবেন। এত শীঘ্র বিচ্ছেদ হবে সেদিন অবশ্য বুঝতে পারি নি। তবু মন খারাপ হয়েছিল। হেলাকে এসে বললাম, "নেতাজী আমাদের মধ্যে বেশীদিন আর নেই।" নেতাজীর কথা ভাবতে বসলেই শর্মা যে কথাগুলো আজও যেন কানে শুনতে পান তা হল নেতাজী ওদের সব সময় বলতেন—স্বাধীনতা এমনি এমনি পাওয়া যায় না, যেদিন অন্তত দু লক্ষ প্রাণ স্বাধীনতার জন্য বলি হবে সেদিন দেশ স্বাধীন হবে।

শর্মা ও আণ্টি দুজনেই নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ডকুমেণ্টারী দেখে অভিভূত। ছবিটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। দুজনেই বললেন, য়ুরোপে সংগঠন গড়ার কাজে ওরা কাছ থেকে নেতাজীকে দেখেছেন। কিন্তু পূর্ব এশিয়াতে ঠিক কি হয়েছিল তা জানা আছে, কানে শোনা আছে, বই-এ পড়া আছে—কিন্তু সেদিন ডকুমেণ্টারী ছবির পর্দায় দেখে যেন সত্যিকারের উপলব্ধি হল।

কে যেন হঠাৎ তদন্ত কমিশনের কথা তুলল। কমিশনের কাজকর্ম কেমন চলছে, চিরদিনই কি একটা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে হবে? আণ্টি কোনদিন ব্যক্তিগত কথা বলতে চান না, চিরদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই ভালবাসেন। সেদিন শর্মার সঙ্গে স্মৃতিচারণায় যোগ দিয়ে মাঝে মাঝে এটা-ওটা বলছিলেন। হঠাৎ বললেন—"বিমান দুর্ঘটনার কথাটা আমি প্রথম কি ভাবে শুনলাম জানো? সন্ধ্যেবেলা কিচেনে বসে একটা উলের গোছা জড়িয়ে জড়িয়ে বল বানাচ্ছিলাম। কিচেনের একপাশে রোজকার মত রেডিওতে সান্ধ্য খবর বলে চলেছে। ঘরের অন্য কোণে মা আর আমার বোন কি যেন করছে। হঠাৎ শুনি রেডিওতে বলছে—ইণ্ডিয়ান কুইসলিং সুভাষচন্দ্র বোস তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মা আর বোন চমকে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। আমি আস্তে কিচেন থেকে বেরিয়ে পাশে শোবার ঘরে উঠে চলে গেলাম। সেখানে অনীতা তখন নিতান্ত শিশু, অঘোরে ঘুমিয়ে আছে—ওর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।" একটু চুপ করে থেকে যথাসাধ্য সহজ গলায় বললেন—'অ্যানড আই ওয়েপট্, আমি কাঁদলাম।'

আমরা সবাই চুপ। হেলা বিচলিত হয়ে বলে উঠল—এই রকম একটা নিষ্ঠুর খবর এইভাবে শুনলে তুমি—কি মর্মান্তিক! দুপুরবেলা খাবার টেবিলে বসে কথা-বার্তা শুরু হয়েছিল, বাইরে কখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে কেউ খেয়াল করিনি। হেলা উঠে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের আলো জেলে দিলে।

॥ ছয় ॥

ভিয়েনা ও প্রাগ-এ আদরযত্নের আতিশয্যে আমরা বেশ স্পয়েল্ড হয়ে গিয়েছি সেটা পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্টে নেমে বুঝতে পারলাম। পৌঁছে যখন দেখলাম কোন বন্ধুবান্ধবের দেখা নেই তখন হঠাৎ বেশ একটু অসহায় বোধ করলাম। আমাদের পূর্ব জার্মানী আসার সিদ্ধান্ত একটু আকস্মিক হলেও আমরা

জার্মান বন্ধুদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলাম। পরে দেখেছিলাম পূর্ব বার্লিনের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করতে অস্বাভাবিক রকম বিলম্ব হয়। যাই হোক, পূর্ব জার্মানীতে নেতাজীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এ ব্যাপারে জার্মান স্কলাররা বিশেষভাবে উৎসাহী, এ খবর আমাদের জানা ছিল। কলকাতাতেই তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটেছিল। Tiger unt Schakal (Tiger and Jackal) নামে নেতাজীর ওপর বই পূর্ব জার্মানীর লেখক ডঃ স্নাবেল Schnabel)-এর লেখা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ক্রুগার, ওয়াইডেমান (Weidemann) প্রভৃতি ভারত-বিশেষজ্ঞ স্কলাররা নেতাজীর ওপর তাঁদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পূর্ব জার্মানীতে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে দলিল ও নথিপত্র পাওয়া গেছে প্রচুর। অতএব আমাদের সফরে পূর্ব জার্মানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সুটকেসটা কি করে যে এত ভারী হয়ে গেল জানি না। হাত প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে—বিমানবন্দরের মধ্যেই এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে বাইরে এসে শহরগামী বাসে চাপলাম। মিনিট দশেক গিয়েই বাস একটা নিতান্ত মফঃস্বল চেহারার একটি স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দিল। শুনলাম বাস আর যাবে না। এ হল বিমানবন্দরের স্টেশন, এখান থেকে শহরের ট্রেন ধরতে হবে। স্টেশনে মস্ত এক ওভারব্রীজ। একটি স্যুটকেস ঘাড়ে করে ওভারব্রীজ পার হবার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। কোন মানে হয়? হয় আমাদের মত সাবেকি থাকো নয়ত পুরোপুরি আধুনিক হও। য়ুরোপের সর্বত্রই এসকালেটর বা চলমান সিঁড়ি নয়ত মুভিং এলিভেটর (অর্থাৎ চলমান লিফট্—দরজাবিহীন লিফট্ এসকালেটরের মত সর্বদাই উঠছে নামছে, টুক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়তে হবে)—নিদেনপক্ষে মালপত্র বইতে পুশকার্ট থাকে। ভবিষ্যতে একখানা মাত্র শাড়ি খবর কাগজে জড়িয়ে ভ্রমণে বার হব এইরকম একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করে ট্রেনে চড়ে বসলাম। প্রথমদিকে মাঠঘাটের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে, বিশেষ কিছু দেখার নেই। শহর নিকটবর্তী হতে ঘরবাড়ি দেখা যেতে লাগল এবং ঠিক শহরে ঢুকবার মুখে কতকগুলো ঘরবাড়ি দেখলাম যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন গায়ে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন এসে থামল ফ্রিডরিখস্ট্রাসে (Friedrichstrasse) স্টেশনে। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে এই ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশনে নেতাজী এসে নেমেছিলেন। এ কাহিনী লোথার ফ্রাংকের। ডাঃ লোথার ফ্রাংক এখন থাকেন পশ্চিম জার্মানীতে ফ্রাংকফুর্টের কাছে উইসবাডেনে। নেতাজীর যে আন্তর্জাতিক জীবনী জার্মান ও জাপানী ভাষায় বেরিয়েছে এবং শীঘ্র ইংরেজিতেও বার হতে চলেছে, তার লেখক-গোষ্ঠীর অন্যতম হলেন ফ্রাংক। সে সময় বার্লিনের ইন্ডো-জার্মান সোসাইটির পক্ষ থেকে নেতাজীকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন ফ্রাংক। প্রায়ই খুব গর্ব করে বুক ফুলিয়ে ফ্রাংক আমাদের বলতেন—জানো, জার্মানীর মাটিতে আমিই প্রথম জার্মান যার সঙ্গে নেতাজী হ্যান্ডশেক করেছিলেন। সেবার ফরেন অফিস থেকে নেতাজীকে হারনাক হাউস নামে এক গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একবার এখানে কয়েকদিন ছিলেন। কিন্তু নেতাজী জার্মান গভর্মেন্টের অতিথি হয়ে থাকতে চাইলেন না। উনি চলে গেলেন বার্লিনের শার্লটেনবার্গ এলাকায় যে গ্র্যান্ড হোটেল আছে সেখানে।

সেবার উনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরেন অফিসে দু'একজন বন্ধুভাবাপন্ন লোক থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থমনোরথ হন। নানা অজুহাতে, যেমন হিটলার বড় ব্যস্ত আছেন ইত্যাদি বলে ও'কে নিস্তর ঘোরানো

হয়। ও'র দেখা করতে চাইবার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিটলার তাঁর Mein Kampf বইতে যেসব ভারত-বিরোধী কথা লিখেছেন তার প্রতিবাদ করা। ও'র দৃঢ় ধারণা ছিল মুখোমুখি কথা হলে উনি হিটলারকে তাঁর ধারণা কতটা ভুল তা বোঝাতে সক্ষম হবেন। এ সুযোগের জন্য তাঁকে প্রায় দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের মে মাসে যখন হিটলারের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাক্ষাৎকার ঘটে সে সময়ে তিনি তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। চলতি গল্প হচ্ছে হিটলার কথা দিয়েছিলেন, পরের সংস্করণে তিনি কথাগুলো তুলে নেবেন। এ কথাটা সঠিক কিনা তা বলা যায় না। হিটলারের দোভাষী পল স্মিডথ বলেন, কথোপকথন কি হয়েছিল ও'র ঠিক মনে নেই। নাম্বিয়ার বলেন, হিটলার এরকম কোন প্রমিস করেননি। কিন্তু সে আমলে হিটলারের মুখের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং উনি তা চুপ করে শুনেছেন এও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বার্লিনের ফরেন অফিসে বিশেষ সুবিধা হল না। নেতাজী তখন মিউনিকে চলে গেলেন। সেখানে জার্মান অ্যাকাডেমির ডিরেকটর ডাঃ থিয়েরফেলডার মারফত উনি ফরেন অফিসে কিছু প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন।

লোথার ফ্রাংক যখন নেতাজীকে ফ্রিডরিকস্ট্রাসে রেল স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন তখন নেতাজী ওয়ারস' থেকে আসছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অনেক টালবাহানা করে তারপর ও'কে শুধু অস্ট্রিয়াতে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে নেতাজী য়ুরোপের একাধিক দেশে পরাধীন ভারতবর্ষের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। ও'র ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যা এড়িয়ে যাওয়া শক্ত হতো। প্রথমেই ভিয়েনাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার কনসাল ও'র সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে ও'কে প্রাগ-এ যাবার অনুমতি-পত্র দিলেন। প্রাগ-এর পোলিশ কনসাল আবার আরো একধাপ এগিয়ে ওয়ারস' যাবার অনুমতি তো দিলেনই, আবার পোল্যাণ্ডে গণ্যমান্য লোকদের কাছে পরিচয়পত্রও লিখে দিলেন। প্রাগের ব্রিটিশ কনসাল কোন প্রশ্ন না তুলেই ও'র পাসপোর্টে সব এনডোর্স করিয়ে দিলেন। এই ঘটনা নিয়ে নাম্বিয়ার এক মজার গল্প বলেছিলেনঃ নেতাজী প্রাগের ব্রিটিশ কনসালের কাছে গিয়ে যখন বললেন, উনি পোল্যাণ্ড যেতে চান তখন ও'র যে অস্ট্রিয়া ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কোন বাধা আছে তা ইচ্ছা করেই উল্লেখ করলেন না। করবেনই বা কেন, যদি বাধা থাকে সেটা ব্রিটিশ কনসালেরই জানবার কথা এবং তার জন্য যা ব্যবস্থা নিতে হয় তিনিই নেবেন। যখন বলা মাত্রই পাসপোর্টে সব ঠিক করে দেওয়া হল তখন ও'র মনে বেজায় দ্বন্দ্ব—এই ভালমানুষ ইংরেজটির না-জানি কি হবে, হয়ত চাকরী নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে।

পরদিন তিনি আবার গিয়ে হাজির। এবার ওকে খুলে বললেন নিজের পরিচয়, কীর্তিকলাপ, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সুনজরে নেই উনি, অস্ট্রিয়ার জন্য শুধু ও'কে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল ইত্যাদি। চুপ করে সব শুনলেন ব্রিটিশ কনসাল। তারপর বললেন—দেখো, তুমি আমাকে এতক্ষণ যা বললে আমার তো তা জানবার কথা নয়। আমার কাছে কোন ব্রিটিশ পাসপোর্টের অধিকারী যদি এসে বিশেষ কোন দেশে যাবার অনুমতি চায় তাকে তার থেকে বঞ্চিত করবার আমার কোন অধিকার নেই। তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যখন আলাদা কোন নির্দেশ নেই, আমার যা স্বাভাবিক কর্তব্য আমি তাই করেছি। এ নিয়ে আমার বা তোমার আর কোন মাথাব্যথা নেই।

কিছুদিন পরে যখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাগজপত্র ঘাঁটছিলাম

তখন পুরো একটা ফাইল বেরিয়ে পড়ল এই ঘটনাটির ওপর। সেক্রেটারি অব স্টেট থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি অফিসার পর্যন্ত নোটের পর নোট দিচ্ছে। প্রাগের কনসালকে "স্টুপিড" বলা হয়েছে। আরে বাবা, নির্দেশ না-হয় দেওয়া নেই, তাই বলে দেখতে পাচ্ছো দাগী আসামী—তাকে কিনা যেখানে সেখানে যেতে দিচ্ছ! এই বুদ্ধি নিয়ে ডিপ্লোমেটিক সার্ভিস করবে! ফাইলের পাতা ওলটাতে দেখি সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে ইংরেজ ব্যুরোক্রাটদের মধ্যে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন যেমন করে পারো লোকটাকে ইংলণ্ডে ঢুকে পড়া থেকে থামাও। সুভাষচন্দ্রের ইংলণ্ড আসা নিয়ে ওদের এত কি আপত্তি, এত ভীতিই বা কেন ঠিক বুঝলাম না। যেন উনি এলেই তাসের দেশের সব নি-য়-ম ভেঙে পড়বে। এদিকে আবার ইংরেজের স্বাভাবিক ন্যায়বোধ যায় না। একজন অফিসার নোট দিলেন—'ব্রিটিশ পাসপোর্ট যার আছে তার ব্রিটেনে আসতে কোন আলাদা এনডোর্সমেণ্ট লাগে না। আজ যদি সুভাষ বোস এসে ইংলণ্ডের কোন বন্দরে নামেন তাঁকে আইনত আমরা কোন বাধা দিতে পারি না।' ওপরতলা থেকে নোট এল তার কাছে—এই স্বাধিকারের কথাটা মনে হয় সুভাষ বোস জানেন না, কারণ তিনি চিকিৎসার ও রকমারি অজুহাত দেখিয়ে আসবার অনুমতি চেয়েছেন। আমাদের সব কনসালেটকে অ্যালার্ট করো যেন এমনভাবে ভান করে থাকে যাতে সুভাষ বোসের এই ভুল ধারণাটা না ভাঙে। ইংরেজের চাতুর্যের সেবার জয় হল। নেতাজী ইংলণ্ডে আসতে পারলেন না। সেবার লণ্ডনে পলিটিক্যাল কনফারেনসে সুভাষচন্দ্রের যে লিখিত বক্তৃতা ওঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করা হয় তার মধ্যে উনি বিশ্বসভায় ভারতের ভূমিকা সম্বন্ধে এক দৃপ্ত ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। বলেছিলেন—সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড পৃথিবীর সভ্যতাকে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র উপহার দিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিয়ে এল স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর বাণী, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী উপহার দিল মার্কসের দর্শন আর বিংশশতাব্দীতে রাশিয়া তার প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবের পথে পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। এরপরই নেতাজী বলছেন—"পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এর পরবর্তী বিশিষ্ট অবদানের ডাক আসবে ভারতবর্ষের কাছ থেকে।"

প্রাগে ও ওয়ারসতে উনি সেবার দুটো বিশেষ জিনিস স্টাডি করে এসেছিলেন—এক, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পরাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার বাইবে চেকোশ্লোভাক লিজিয়ন বা মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল ইংরেজ ও রাশিয়ার সাহায্যে। আর জাপানে গঠিত হয়েছিল পোলিশ লিজিয়ন বা মুক্তিফৌজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। জানতে ইচ্ছা হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনার বীজ কি তখনই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল?

ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশন থেকে ভারতীয় দূতাবাস বেশ কাছেই। একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম আমাদের পতাকা পত পত করে উড়ছে। বিদেশে নিজের দেশের ফ্ল্যাগ দেখলে এত ভাল লাগে! আমাদের কনসাল-জেনারেল আজমানী আমাদের দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন—এয়ার-পোর্টে আমার মেসেজ পাননি। কোন ফ্লাইটে আমরা আসছি ঠিকমত না জানাতে আমরা এসে পৌঁছলে যেন ফোন করি—এই রকম একটা মেসেজ দেওয়া ছিল। যাই হোক, আজমানী সাহেব আমাদের জন্য লাঞ্চ তৈরী করিয়ে অপেক্ষায় বসে আছেন। শুধু তাই নয়—আমাদের যা কিছু অ্যাপয়েন্টমেণ্ট প্রয়োজন সব কিছু করে আমাদের কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। বললেন—যদিও যোগাযোগের গণ্ডগোলে সব কিছু খবর নিতান্ত দেরীতে পেয়েছি তবুও এত শর্ট নোটিসে হলেও যাতে আপনাদের নেতাজী মিশন যথাসাধ্য সার্থক

হয় তার চেষ্টা করছি। পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম আমার ভবিষ্যৎ লেখায় এই চ্যাপটারটির নাম দিতে হবে—friendless in East Berlin —বিধাতা অন্তরীক্ষে হেসে থাকবেন। আজমানী সাহেবের আতিথ্যে ও সহযোগিতায় পূর্ব বার্লিনে আর যাই হোক, বান্ধবহীন মনে হয়নি এক মুহূর্তও।

বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাকিস্তান বা চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক লড়াইতে, কি ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য প্রচারকার্যের ব্যাপারে—আমাদের দূতাবাসের অফিসারদের অক্ষমতার জন্য আমাদের দেশকে প্রায়ই অপদস্ত হতে হয়—এমনি একটা অভিযোগ আছে। এ অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা কিন্তু নয়। বিদেশে পাঠাবার আগে আমাদের অফিসারদের যোগ্যতা, নিজের দেশ ও যে দেশে তিনি কার্যরত সেই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত। কিন্তু এবার এদিক-ওদিক—প্রাগ, পূর্ব বার্লিন ও বনে দু'একটি বেশ স্মার্ট, কর্মক্ষম অফিসারদের দেখে দূতাবাসগুলি সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই বলে মনে হয়েছে।

অবশ্য দু'একটা মজার অভিজ্ঞতা এবারও যে না হয়েছে তা নয়। একটি য়ুরোপীয় শহরে আমাদের দূতাবাসের জনৈক অফিসার আমাদের সাদরে নিমন্ত্রণ করে বললেন, আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আসুন। সঙ্গে আমাদের বন্ধু এক বিদেশী স্কলারকেও বললেন। রাত আটটায় নেমন্তন্ন। আমাদের নিজে গাড়ী করে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, ও'র বাড়িতে জনৈক ভারতীয় ইনটেলেকচুয়াল অতিথি হয়ে রয়েছেন; তার সঙ্গে আলাপ করে আমাদের খুবই ভাল লাগবে।

বসবার ঘরে বসে গল্পগুজব হচ্ছে। সেই ভারতীয় ইনটেলেকচুয়ালটি একবার হাত তুলে নমস্কার করে চুপ হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বলছেন না। প্রায় দশটা বাজে। ভাবছি এখন ডিনার দেবে। এমন সময় গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—হোয়াট্ অ্যাবাউট এ কাপ অফ টি? টি—? চা দেবে? রাত দশটায়? আমরা করুণ মুখে ঘাড় নেড়ে তাইতেই রাজী হলাম। চা আর কিছু ঠান্ডা আলুভাজা এল। ইনটেলেকচুয়াল মৌন ব্রত পালন করে চলেছেন।

রাত বারোটা নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম। গৃহকর্তা বসবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের ও'র বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলেন—থ্যাংক ইউ ফর কামিং, গুড নাইট্। গুড নাইট্ শুনে আমার তো মুখ শুকিয়ে এল। সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর, ভাষা জানি না। বিদেশী বন্ধুটি য়ুরোপের অপর প্রান্তের অধিবাসী। তিনিও কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে তাকালেন। আমরা বাড়ি ফিরব কেমন করে? লিফটের সামনে সবাই দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় মৌনভঙ্গ করে ইনটেকেলচুয়ালটি হঠাৎ প্রায় গর্জন করে বিদেশী স্কলারটিকে বললেন—ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না। আমাকে দিন তিনেক সময় দিতে পারবে? তোমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো।

বিদেশী বন্ধুটি য়ুরোপের একটি খ্যাতনামা এশিয়া সেণ্টারে ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান। বিনীতভাবে জানালেন, কালই উনি দেশে ফিরছেন, তাই সময় করে উঠতে পারবেন না।

সেদিন ওরা আমাদের বাড়িতে পেঁৗছে দিয়েছিলেন। পরে বুঝলাম যে আমাদের সঙ্গে যখন বাড়ি পর্যন্ত যাবেন, তখন ড্রয়িংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক্ করে থ্যাংক ইউ, গুড নাইট না বললেও যে চলত সেটা বোধহয় উনি ঠিক জানতেন না।

সেদিনের ঘটনায় বিদেশী পণ্ডিত বন্ধুটির কাছে আমরা একটু লজ্জা

প্যাচ্ছিলাম। আমাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উনি যা বললেন তা আরোই মারাত্মক। বললেন, ও কিছু নয়, আমার এরকম অভ্যাস আছে। কারণ আমাদের দেশে তোমাদের যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জানেন না আর তোমাদের দেশ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

যাই হোক, আগেই বলেছি এ'রাই সব নন। সৌভাগ্যবশত বুদ্ধিমান, কর্মক্ষম, স্মার্ট অফিসারও দেখেছি অনেক।

পূর্ব বার্লিনে কনসাল-জেনারেলের পদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কনসুলেটটি সবে অল্প দিন খোলা হয়েছে। আজমানী অত্যন্ত উৎসাহী ও দক্ষ, ভাল জার্মান বলেন। যদিও এর আগে বেশ কয়েক বছর ধরে জাপানে ছিলেন। আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, কাজ-চলার মত জাপানীও শিখে নিয়েছিলাম। আমরা থাকতে থাকতেই দেখলাম, উপস্থিত ভারতীয় নাগরিকদের উনি খুবই দেখাশুনো করেন। নানা কারণে পূর্ব বার্লিনে বিদেশীর পক্ষে এই অফিসিয়াল সাহায্যটুকু প্রয়োজন হয়। অবশ্য কেউ যদি ওদেশের সরকারী অতিথি হিসেবে আসেন তাঁর কথা আলাদা। এখানে যে-কোন বিদেশীকে হোটেলে গিয়ে থাকতে হলে ডবল চার্জ দিতে হয়। আজমানী যখন পার্টি দেন ও'র বাবুর্চিই সব ব্যবস্থা করে, নয়তো হোটেলে প্রচন্ড খরচ। ও'র বাবুর্চি একটি রত্ন—চমৎকার রাঁধে, চট্টগ্রামে বাড়ি। যে ক'দিন ছিলাম নিত্য নূতন রে'ধে খাওয়াত।

প্রথম দিনেই একচক্কর ঘুরে পূর্ব বার্লিন দেখে নিলাম। প্রধান রাস্তা দুটি—বিখ্যাত উনটার ডেন লিনডেন (Unter den Linden) এবং কার্ল মার্কস আলে। কিছুকাল আগে এ রাস্তার নাম ছিল স্ট্যালিন আলে। বড় বড় হোটেল, ঝলমলে দোকান সবই এখানে। দূরে বিরাট টি ভি টাওয়ার, তার ওপর ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ। আলেকজাণ্ডার প্লাৎস ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওদের মস্ত বড় ডিপার্টমেণ্ট স্টোর সেনট্রুমে ঢুকে পড়লাম। ক্যামেরার ফিলম, সাবান-টুথপেস্ট জাতীয় টুকিটাকি জিনিস কিনেও ফেললাম। আজমানী অনেক সময় পশ্চিম বার্লিনে কেনাকাটা করেন। বেরোবার সময় জিজ্ঞাসা করতেন—ওয়েস্ট বার্লিন যাচ্ছি, কিছু দরকার নাকি?

উনটার ডেন লিনডেন এককালে ছিল থিয়েটর, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির রাস্তা। এখন এর চরিত্র গেছে পালটে। প্রায় সবই অফিসিয়াল ঘরবাড়ি, রাস্তার অনেকখানি জুড়ে রাশিয়ান দূতাবাস। বার্লিনের পার্গামন মিউজিয়াম দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। দিনের বেলায় ঘুরে ফিরে পূর্ব বার্লিন দেখে আমার খুবই ভাল লাগল। তবে ঘুরতে ফিরতে চোখে পড়ে বার্লিনের দেওয়াল আর ব্র্যানডেনবুর্গ গেট। কিন্তু রাত্রে আজমানীর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়ে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রাত আটটা হয়েছে কি হয়নি—সমস্ত পথঘাট জনশূন্য খাঁ-খাঁ করছে, ঠিক যেন কলকাতার হরতালের দিন। দিনের বেলা দেখেছিলাম মোটর-গাড়ির সংখ্যা খুবই কম—বড় বড় পার্কিং স্পেস ফাঁকা পড়ে রয়েছে। য়ুরোপীয় দেশে এটা খুব অস্বাভাবিক ঠেকে। লণ্ডনে বাড়ি থেকে গাড়িতে বেরিয়ে য়ুনিভার্সিটি এলাকা পর্যন্ত এসে গাড়ি পার্ক করে উল্টো দিকের বাসে চেপে গ্লোব থিয়েটারে থিয়েটর দেখতে গেলাম—এইরকমটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাত্রের পূর্ব বার্লিন আমার একান্ত অস্বাভাবিক মনে হল। পশ্চিম বার্লিন ও হামবার্গের রাত্রের ঝলমলে রূপ পরে দেখেছিলাম, ভিয়েনার রাত্রির মন-ভোলানো চেহারার কথা না হয় বাদ দিচ্ছি—কিন্তু প্রাগে তো দেখে এলাম সারারাত ঘড়ঘড় করে ট্রাম চলে, রাত ১২টার পর ট্রামের ভাড়া অবশ্য দ্বিগুণ হয়ে যায়। তবুও কত রাত্রি অবধি রাস্তা লোকজনে পূর্ণ হয়ে থাকে। আজমানীকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা সব গেল কোথায়?

আজমানী রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, এখানকার লোকেরা স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কাজকর্মের পর সবাই সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গেই কাটাতে ভালবাসেন।

॥ সাত ॥

পরদিন আজমানীর সঙ্গে ওঁর গাড়িতে আমরা পটসডাম রওনা হয়ে গেলাম। পূর্ব জার্মানীর ইনস্টিটিউট ফর ইনটারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পটসডামে অবস্থিত। সেখানকার সাউথ ইস্ট এশিয়া বিভাগের ডঃ ওয়াইডেমানের সঙ্গে কলকাতাতেই আলাপ হয়েছিল। প্রথমে আমরা ওয়াইডেমানের বাড়িতেই গেলাম। সেখান থেকে উনি আমাদের ইনটারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেলেন। ইনস্টিটিউটের বাড়িটি একটি বিরাট প্রাসাদ, বেশ জাঁকজমকপূর্ণ চেহারা, খুব সুরক্ষিতও বটে। ফটকে শান্ত্রীকে ছাড়পত্র দেখিয়ে তবে ভিতরে যাবার হুকুম হল। ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর ডাঃ হান্ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ডাঃ হান্-এর সঙ্গে একটা ছোটখাট কফি বৈঠক হল। প্রথমে ও'রা ওদের ইনস্টিটিউটের কাজের ধারা সম্বন্ধে বললেন। এই ইনস্টিটিউটে পূর্ব জার্মানীর সব ডিপ্লোম্যাটদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। কলকাতার বর্তমান পূর্ব জার্মান কনসাল-জেনারেলও ওখানকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং অধ্যাপক ডাঃ হানের ছাত্র। এ ছাড়া গবেষণার কাজও এখানে সমানে চলে। ট্রেনিং-এর কাজ ও গবেষণার কাজ দুটো একসঙ্গে কখনো কখনো একটু বেশীই হয়ে পড়ে।

এরপর ওঁরা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজের ধারা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করলেন। পূর্ব জার্মানীতে নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণার কাজ হচ্ছে অনেক জায়গায়। ক্নাবেলের লেখা বই-এর কথা তো আমরা জানি। লাইপজিগের কার্ল মার্কস য়ুনিভার্সিটিতে ডাঃ সেলটার কাজ করছেন, বার্লিনের ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউটে ডাঃ ক্রুগার গবেষণা করছেন। ওয়াইডেমান নিজে কিছু কিছু কাজ করেছেন। নেতাজীর জীবনী লেখবার একটি প্রস্তাব ওঁর আছে। ইস্ট জার্মানীর জনসাধারণের মধ্যে নেতাজীর একটি পপুলার জীবনীর বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়েছে বলে পাবলিশাররা বলছেন। কিন্তু ডিপ্লোম্যাটদের ট্রেনিং দেওয়া ও ছাত্রদের রিসার্চের কাজ দেখাশুনা করা ইত্যাদি করে এ কাজে হাত দেবার সময় পাননি ওয়াইডেমান! বললেন—যদি লিখি যথেষ্ট সময় নিয়ে ভালভাবে লিখতে চাই। পটসডামের পলিটিক্যাল আর্কাইভস-এ নেতাজীর ওপর অনেক দলিলপত্র রয়েছে। ওঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩৩-এ সমস্ত দলিলপত্র প্রকাশিত হবে। এ সব কাজে ওঁরা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

পূর্ব জার্মান স্কলাররা নেতাজী সম্পর্কে আলোচনায় যে জিনিসটির ওপর জোর দেন তা হল এই যে, হিটলার ও তার নাৎসী গভর্নমেণ্ট নেতাজীকে বিশেষ কোন সাহায্য দিতে তো ইচ্ছুক ছিলেন না বরং প্রতিটি ব্যাপারে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন। কারণ নেতাজী তো নাৎসী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি শুধু তাঁর নিজের দেশের মুক্তি আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে তাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। এ কথাগুলো সত্য এবং যারা নেতাজীকে ফ্যাসিস্ট বলে অপবাদ দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের অনুধাবনযোগ্য।

আবার তেমনি এ ব্যাপারের অন্য একটা দিক আছে। তদানীন্তন জার্মান গভর্নমেণ্ট নেতাজীকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করে-

ছিলেন। একথা স্বীকার না করা আমাদের ভারতীয়দের পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হবে। আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালে নাম্বিয়ার ও বালকৃষ্ণ শর্মা দুজনেই মুক্তকণ্ঠে একথা বলেছিলেন যে, 'জার্মানরা যখন একবার আমাদের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার ও নেতাজীকে মেনে নিল তখন যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা আমাদের ছেড়ে যায়নি। যুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানরা নিজেরাই তখন পর্যুদস্ত, আমরা তাদের উপর একটা বোঝা, তবু আমাদের সঙ্গে তাদের যা কিছু চুক্তি, যা কিছু প্রতিশ্রুতি সব তারা রক্ষা করে চলেছিল।' আমার মনে হয় এটা নাৎসী বা অ-নাৎসীর কথা নয়, এটা জার্মান চরিত্রের একটা মূল কথা।

ওয়াইডেমানের বাড়িতে ফিরে এলে পর মিসেস ওয়াইডেমান অনেক যত্ন করে চা খাওয়ালেন। ছেলেমেয়েরা সবাই বাড়িতে ছিল না। যে ছেলেটি বাড়িতে ছিল সে 'হ্যালো' বলে লজ্জিতভাবে এসে দাঁড়ালো। বিদেশে গেলে আমি সব সময় বিদেশীদের স্বগৃহে, হোমে যেতে ভালবাসি। সেখানেই যেন সহজে অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়। হোটেলে, রেস্তোরাঁয় সভাসমিতিতে তা হয় না। একই কারণে বিদেশী বন্ধুরা কলকাতা এলে তাদের রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে নিয়ে না গিয়ে নিজেদের বাড়িতে এনে ডাল ভাত খাওয়ালেও ভাল লাগে। পটসডামে তাই ওয়াইডেমান-গৃহে কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে খুব আনন্দ হল।

আজমানীকে পশ্চিম বার্লিনে যেতে হবে একবার বিশেষ কাজে। দেরী হয়ে যাচ্ছে। যেখান-সেখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম জার্মানী যাওয়া যায় না। আজমানীকে ফিরতে হবে পূর্ব বার্লিনে, সেখানে দুটো চেক পয়েণ্ট দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি ওঁর আছে। ওয়াইডেমান প্রস্তাব করলেন—আজমানী সাহেব গাড়ি নিয়ে ফিরে চলে যান—তোমরা পটসডাম ঘুরে ফিরে দেখে রাত্রে ফিরে যেও। অনেক ট্রেন আছে।

ওয়াইডেমানের কল্যাণে আমাদের পটসডাম দেখা হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পটসডাম চুক্তির কথা এত শুনেছি, এই চুক্তি যেখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই সিসিলিয়েনহোফ কাসল দেখাতে নিয়ে গেলেন ওয়াইডেমান। ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখালেন—এই ঘরে স্টালিন বসতেন, এখানে প্রথমে চার্চিল পরে এটলি (কারণ পটসডাম সম্মেলন চলার মধ্যে চার্চিল নির্বাচনে পরাজিত হলেন), এ ঘরে ট্রুমান। এই কাঠের সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন সমবেত সাংবাদিকরা। আর তাদের মধ্যে ছিলেন জন এফ কেনেডি—তিনি সাংবাদিকতা করছিলেন। বড় বড় টেবিল চেয়ার দড়ি দিয়ে ঘের দেওয়া। একবার এক আমেরিকান ট্যুরিস্ট ছুরি দিয়ে ট্র্যুমানের ব্যবহৃত টেবিল না চেয়ার কিসের যেন কাঠের টুকরো কেটে নিয়ে গিয়েছিল স্যুভেনির হিসাবে—তারপর থেকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। সিসিলেয়েনহোফ কাসলের সঙ্গে লাগোয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বাগান। এক পাশে আর একটি বাড়িতে মিলিটারি মিউজিয়াম। সিসিলিয়েনহোফ কাইজার উইলহেলম (দ্বিতীয়) ১৯১৩-১৬ সালে যুবরাজের জন্য বানিয়ে দিয়েছিলেন। পটসডামে দেখবার মত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ আরো বেশ কয়েকটি রয়েছে। আমরা ট্রামে চেপে ঘুরে ঘুরে যতটা সম্ভব দেখলাম। তখন বিকেলবেলা, সব স্কুল-অফিস ছুটি হয়ে গেছে, বেশ ভীড়ের ট্রাম। প্রতিবারই হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে যেতে হল। হাসি-খুশি উজ্জ্বল চেহারা স্কুলের ছেলেমেয়েরা পিঠে ব্যাগ বাঁধা, দল বেঁধে কিচির-মিচির করতে করতে চলেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে প্রশ্ন জাগল, কম্যুনিস্ট অ-কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সব দেশের ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা একই রকম হয় কেন?

সন্ধ্যাবেলা ওয়াইডেমান পটসডাম স্টেশন থেকে দোতলা ট্রেনে তুলে দিলেন।

বললেন, দোতলায় বসো, বেশী ভাল লাগবে। ট্রামের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে অথবা স্টসডামের সব সেকালের বুর্জোয়া প্রাসাদের অপূর্বসুন্দর বাগানে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াইডেমান সমানে নেতাজী সম্বন্ধে আলোচনা করে চলেছেন। পৃথিবীর কোথায় কি কাজ হচ্ছে নেতাজী সম্বন্ধে সব খবরই রাখেন। একবার বললেন, পশ্চিম জার্মান টেলিভিশন নেতাজীর ওপর যে ডকুমেণ্টারি ছবি তৈরী করেছে সেটা কি দেখেছ? পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনের কর্মীদের সঙ্গে পরে যখন হামবুর্গে দেখা হল, ওরা জানতে চাইল—শুনেছি পূর্ব জার্মানরা নেতাজীর ওপর একটা ডকুমেণ্টারি করতে চায়, তোমরা কিছু শুনে এলে নাকি? ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা পেঁছে গেলাম বার্লিনের ফ্রিডরিকস্ট্রাসে স্টেশনে।

শুনেছিলাম পূব থেকে পশ্চিম বার্লিনে সীমানা পার হবার সময় বড্ড হাঙ্গামা হয়, দেরী হয় অনেক। ভিয়েনাতে বন্ধু মুখার্জিরা বলছিলেন, ওঁদের দু' ঘণ্টা লেগেছিল, আর ওদের মোটরগাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছিল। আজমানী নিজে সঙ্গে এসে ওদের ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের গাড়িতে পূব থেকে পশ্চিমে পার করে দেওয়াতে আমাদের পার হতে দু' মিনিট লাগল। বিদেশীদের বার্লিন দেওয়াল পার হতে হয় চেক পয়েণ্ট চার্লিতে, একবার পাসপোর্ট দেখালাম, আর কিছু নয়।

অনেকক্ষণ থেকে আজমানী রহস্য করছিলেন, আজ তোমাকে ব্রেকফাস্টে এমন একটা জিনিস খাইয়েছি যা বার্লিন-ওয়াল পেরিয়ে ওপারে গেলে বলব, নয়ত তুমি বেজায় শকড্ হবে। আমি বললাম, বলেই ফেলুন, কিছু হবে না, বিদেশে কি সব বাছবিচার চলে। সকালে ডিম ও সালামি খেয়েছিলাম বটে। বার্লিন-দেওয়াল পেরিয়ে শুনলাম সালামিটা ঘোড়ার মাংসের ছিল। একটু শকড্ হলাম, তবে খেয়েই যখন ফেলেছি কি আর করা!

পশ্চিম বার্লিনে পা দিলেই বোঝা যায় ধনে-জনে-সমৃদ্ধিতে এই শহর ঝলমল করছে। বার্লিন থেকে পরে যখন পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান রাজধানী বন-এ এলাম তখন মনে হল—এ কি! এ যে গ্রাম। পশ্চিম বার্লিনে আমরা কাজ থেকে ছুটি নেব ঠিক করলাম। ট্যুরিস্টদের মত ঘুরে ঘুরে বার্লিন শহর দেখতে লাগলাম। অবশ্য সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য বার্লিনের দেওয়াল। পশ্চিম জার্মানরা খুব উৎসাহ করে দেওয়ালের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখায়, নানারকম গল্প বলে। কি ভাবে লোকে ওপার থেকে পালিয়ে আসত তার করুণ, বেদনাদায়ক কত যে কাহিনী। প্রথমে টুকটাক নুড়ি ফেলত ওরা। সংকেত পেলে এপারের লোকেরা মস্ত মাছ ধরার জাল পেতে দাঁড়িয়ে যেত। তখন তিন-তলা চার-তলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত পলাতকেরা। তারপর সীমানা জুড়ে সব বাড়িগুলো ওরা ভেঙে ফেলে দিলে, একতলা সমান উঁচু দেওয়ালটুকু শুধু রাখা হল। তার ভাঙা কাচের জানালায় এখনো ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে এখানে-ওখানে। মেমোরিয়াল করে রেখেছে ওরা—যেখানে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালাতে গিয়ে প্রাণ হারালো বহু মানুষ সেখানে একটা। আর একটার নাম গ্র্যান্ডমাদারস মেমোরিয়াল। এক আশী বছরের গ্র্যাণ্ডমাদার ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এখানে, নীচে ফিশিং নেট পাতা ছিল বটে—কিন্তু সেই নেটের উপরই মারা গেল বুড়ী।

কাল্পনিক, উপাদেয় গল্পও আছে। রাস্তার এপার-ওপার দুই রাষ্ট্র। দু' দিকের সাইড-ওয়াক অর্থাৎ ফুটপাথে শিশুরা খেলছে। এপারের শিশুরা কলা খাচ্ছে। ওদিককার বাচ্চাদের দেখিয়ে বললে—সি উই হ্যাভ বানানা (bananas), ওপারের বাচ্চারা গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—উই হ্যাভ সোশ্যালিজম। শুনে এরা প্রথমে একটু মুষড়ে পড়েছিল। তারপর উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—ওয়ান ডে উই

শ্যাল অলসো হ্যাভ সোশ্যালিজম। শুনে অপর বাচ্চারা বললে—দেন ইউ উইল হ্যাভ নো বানানাজ।

বার্লিনের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন সিস্টেম পূব-পশ্চিম দু' দিকেই চলে—আয়টা পায় পশ্চিম বার্লিন। আর মাটির ওপর স্ট্রীটবান বা স্ট্রীটকারও দু' দিকে যায়, তার আয় পায় পূর্ব বার্লিন। এপার-ওপার গাড়ি এক, বদল হয় শুধু ড্রাইভার ও কনডাকটর। এমন কি শহর দেখাবার ট্যুরিস্ট বাসেরও সেই ব্যবস্থা।

মিসেস কিটি কুর্টির কথা আগেই বলেছি। অন্তত আধ ডজন চিঠি দিয়েছিলেন, "আমার কথা মনে করে কুরফুরস্টেনডামের পথে নিশ্চয় হাঁটবে।" আমরা কু'ডামের খুব কাছেই ছিলাম। কাজে অকাজে অনেকবারই ও-পথে যাতায়াত। প্রায় পুরো কু'ডামের ফুটপাথ জুড়ে হিপি ও হিপিনীরা আসন বিছিয়ে কলকাতার ধর্মতলার কায়দায় বসে গেছে। আর আংটি-মালা টুকিটাকি বিক্রি করছে। একপাশে ভেঙে যাওয়া চার্চের চূড়া আর তার গা ঘেঁষে গোলাকৃতি আধুনিক গির্জা। ওরা এই যুগল গির্জাকে বলে পাউডার লিপস্টিক। ১৯৩৩-এ কিটি কুর্টি যখন নেতাজীকে এ পথ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন তখন এ পথের চেহারা নিশ্চয় ভিন্ন ছিল। ওর বইয়ের গোড়ার প্যাসেজটা মনে পড়ছিল—

"১৯৩৩। বার্লিন, জার্মানী। আমি কুরফুরস্টেনডামের পথে হেঁটে চলেছি। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া, গাছগুলিতে ফুল ধরেছে, লেসের মত কারুকাজ করা পাতার বাহার। কিন্তু আমি সুখী নই। ফুলের দোকানে ফুল উপচে পড়ছে, লাল-টুকটুকে গাল, মোটাসোটা স্ত্রীলোকটি আমাকে নীল, সুগন্ধি ভায়োলেট ও মধুরঙা ড্যাফোডিল দিতে চাইল। কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি সুখী নই। কারণ মাত্র তিন মাস হল অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতায় এসেছেন, অস্ট্রিয়ান অ্যাডলফ হিটলার।"

অসুখী মিসেস কুর্টি পথ হেঁটে যেতে যেতে আকস্মিকভাবে দেখেছিলেন একজন ভারতীয়কে, দেখেই মনে হয়েছিল—a man of spirituality.

যুদ্ধের সময় নেতাজী বার্লিনে সোফিয়েন স্ট্রাসের ওপর একটি বাড়িতে থাকতেন। বেশ প্রকাণ্ড ভিলা, পিছনে মস্ত লন। জার্মান গভর্নমেণ্ট তাঁর ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। এই বাড়ির গল্প আর্ণ্টির কাছে এবং পরে নাম্বিয়ারের কাছে অনেক শুনেছি। লোথার ফ্রাংকেরও পরিচয় ছিল এই বাড়ির সঙ্গে। নাম্বিয়ার বলেছিলেন—অন্তত ত্রিশটা ঘর ছিল এই বাড়িতে, নেতাজী ব্যবহার করতেন মাত্র দু'খানা। একটা আপিস ঘর, আর একটা শোবার ঘর। চিরদিন ওঁর যেমন সাদাসিধে জীবনযাপন। কিন্তু তা হলে কি হবে। জার্মান গভর্নমেণ্ট বাড়ি যখন দিয়েছে তখন মস্ত বড় ও পদমর্যাদার যোগ্য বাড়ি দিতে হবে বই কি! এ বিষয়ে উনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এখানে ভারতবর্ষের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। যুদ্ধের শেষের দিকে বোমা পড়ে এই বাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়—হতাহত হয়েছিল অনেক। নাম্বিয়ার নিজে তখন ও বাড়িতে রয়েছেন।

আর্ণ্টি বলতেন—সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে। একবার তাই খোঁজ করে জানতে পারি ওখানে আর একটা বাড়ি হয়েছে, সেটা 'কারিটাস' সংস্থার। তোমরা যখন বার্লিন যাবে তখন খুঁজে দেখো। অতএব আমরা একদিন সোফিয়েন-স্ট্রাসের সন্ধানে বার হলাম। যাকেই বলি সে-ই একটু অবাক হয়ে থাকে। কিছু আন্ডার-গ্রাউন্ডে কিছু পায়ে হেঁটে অনেক খোঁজা হল। একবার এক ফুলওয়ালী এমন এক পথ-নির্দেশ দিলে যে আমরা সোফিয়েনশার্লট স্ট্রাসে নামে সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় এসে পড়লাম। জায়গাটা খুঁজে না-পেয়ে দুঃখিত হলাম। পরে সুইজার-

ল্যাণ্ডে এসে নাম্বিয়ারকে যখন দুঃখের কথা বলছি উনি বললেন, সে জায়গাই আর নেই, তোমরা খুঁজে পাবে কি করে। এখন যেখানে রয়টার প্লাৎস—রাস্তাটা সেখানে ছিল। এ বাড়ির বাগানে পায়চারি করতে করতে নেতাজী অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। ঘরের ভিতর সব কথা বলা সব সময় নিরাপদ ছিল না। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানে কথা বলে কাটাতেন।

আণ্টির কাছে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। ওটা ছিল হিরো ওয়ারশিপের যুগ। একবার একটি অল্পবয়সী মেয়ে—নেতাজীর গুণমুগ্ধ বলা চলে—কেমন করে যেন সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছিল। নেতাজী হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে বললেন—একটা কাণ্ড হয়েছে, একটি মেয়ে বাগানে ঢুকে পড়েছে।

আণ্টি হেসে বললেন, তা আমি কি করব, আমার জন্য নিশ্চয় আসেনি। আঃ—নেতাজী বিরক্ত হলেন। তখন বাগানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কি চায়। সে শুধু নিঃশ্বাস ফেলে আর বলে—I have seen him— দেখে এলেম তারে।

অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো গেল, দেখা যখন পেয়েছ তখন আর কেন, এবার তবে এসো।

ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের দপ্তর অবশ্য ছিল বার্লিনের টিয়েরগার্টেন এলাকায় লিখটেনস্টাইন আলেতে (Lichtenstein Allee) কিন্তু নেতাজীর সোফিয়েন-স্ট্রাসের বাসভবনই ছিল সব কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল। এই বাড়ি আজ আর নেই অথচ এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর একটা সেণ্টিমেণ্টাল দিকও আছে—সুভাষচন্দ্রের স্বল্পস্থায়ী গৃহীজীবন এই বাড়িতে কেটেছে।

॥ আট ॥

বন-এ নেতাজী সম্মেলন কয়েকটা দিন পিছিয়ে গেল। যে সময়ে দিন স্থির ছিল তার মধ্যে একটা উইক-এণ্ড পড়ে যাওয়াতে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ডাঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ চিঠি লিখলেন—জার্মান ফরেন অফিস এবং সংবাদপত্রের লোকেরা কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে বলছে, বন-এর ভারতীয় দূতাবাসেরও তাই মত। আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই। আমরা পুরনো বন্ধু ডাঃ লোথার ফ্রাংকের সঙ্গে কয়েক দিন কাটাতে উইসবাডেন চলে গেলাম।

বার্লিন থেকে প্যান-আম-এ ফ্রাংকফুর্ট এসে নামলাম। পশ্চিম বার্লিনের টেম্পলহোফ বিমান বন্দরটি খুবই সমৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত মনে হল। হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এই ফ্লুগহাফেনের মাধ্যমেই প্রধানত বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনের যোগ। ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্ট থেকে লোথার ফ্রাংক আমাদের উইসবাডেনে নিয়ে এলেন। ফ্রাংকফুর্ট-উইসবাডেন পথের দু' ধারে আপেল গাছের সার। গাছগুলো আপেলের ভারে আনত. আপেলের গাঢ় লাল রঙে গাছের সবুজ ঢাকা পড়ে গেছে। গাছের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে কত আপেল। শুনলাম এদের আপেলে অরুচি. ভাবলাম পারলে কিছু কলকাতা নিয়ে যেতাম।

উইসবাডেন একটি সুন্দর জার্মান পাহাড়ী শহর। অবশ্য এ শহর সুইজার-ল্যাণ্ডে হতে পারত, কাশ্মীরেও হতে পারত। ফ্রাংক যখন তাঁর নেতাজী সম্পর্কিত লেখার কাজের জন্যে কিছুকাল কলকাতায় কাটিয়েছিলেন. তখন কলকাতার হতশ্রী চেহারা ওঁকে খুব পীড়া দিত। আমি এতে ক্ষুণ্ণ বোধ করতাম। থিয়েটার রোডে

ওঁর বাসস্থান থেকে এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে ছিল ওঁর নিত্য যাতায়াত। আমি ভাবতাম এ তো কলকাতার পরিচ্ছন্নতম এলাকা, এতেই এত কাতর হবার কি আছে। উইসবাডেনে পা দিয়ে বুঝলাম এ শহরের অধিবাসীর পক্ষে কলকাতায় প্রবাসজীবন যন্ত্রণাদায়ক হতে বাধ্য।

প্রকৃতি যেমন অকৃপণ হাতে উইসবাডেনকে সুন্দর করে গড়েছে, মানুষের হাতের ছোঁয়ায় তেমনি এ শহর সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। শহরের মাঝখানে বিস্তীর্ণ গালিচার মত সবুজ মাঠ, তাতে মরসুমী ফুলের বাহার, মাঝে মধ্যে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ। চারপাশে পাহাড়ের ঢালে ঘরবাড়ি, গাছপালা সব মিলেমিশে নিখুঁত প্যাটার্ন। পথঘাট পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক করছে। শহরের কাছাকাছি কোন কারখানা করবার অনুমতি দেওয়া হয় না—পাছে কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় আবহাওয়া পঙ্কিল হয়। শহর থেকে কিছু দূরে রাইন নদীর তীরে একটি মাত্র কারখানা আছে, তাতে শ্যাম্পেন তৈরি হয়। বার্লিন থেকে এলে আরো যা ভাল লাগে, যুদ্ধের কোন ক্ষতচিহ্ন এ শহরের গায়ে নেই। উইসবাডেনে আমেরিকানদের একটি এয়ারবেস আছে। ফ্রাংক তাই বলেন—ওরা আস্তানা গাড়বে বলে জায়গাটা আগেই পছন্দ করে রেখেছিল কিনা, তাই আর বোমা-টোমা ফেলে ধ্বংস করেনি। যদিও অদূরে ফ্রাংকফুর্ট শহর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ফ্রাংকদের ছিমছাম, ছোট, দোতলা বাড়ি। পিছনে বাগানে পীচ ফলের গাছ ফলে ভরে আছে। গাছ থেকে পীচ পেড়ে নিয়ে খেতে খেতে বাগানে ঘুরে ঘুরে মিসেস ফ্রাংকের সঙ্গে গল্প হতো রোজ। ওদের রাস্তাটার নাম Schauinsland—সার্থকনামা বলা যায়। সত্যিই সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়।

ফ্রাংক বললে, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ যে রকম আয়োজন করছেন বন-এ—টেলিফোনে রোজ যা খবর পাচ্ছি—বন-এ পেঁছলে তোমরা এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না, একেবারে মিনিট-টু-মিনিট প্রোগ্রাম। উইসবাডেনে কদিন একটু রিল্যাকস্ করে নাও। সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। ফ্রাংকের কাছে ত্রিশ দশকে নেতাজীর য়ুরোপে প্রবাসজীবনের গল্প শুনব আর মাঝে মাঝে মিসেস ফ্রাংক গাড়ি চালিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু বিশ্রামের যে খুব সময় পাওয়া গেল তা নয়।

হাইডেলবার্গ থেকে সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর ডাঃ ডিটমার রোথারমুনড টেলিফোন করলেন। ওঁরা উইসবাডেন আসবেন আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে, না আমরা হাইডেলবার্গ যাব ওঁদের কাছে—এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। রোথারমুনডের ভারতীয় স্ত্রী ইন্দিরা বললেন, তোমরাই আমাদের কাছে এসো। তুমি তো হাইডেলবার্গ দেখোনি, দেখা হয়ে যাবে, ডাঃ বসু অনেকদিন আগে এসেছেন—পুনর্দর্শনে ভালই লাগবে।

মিসেস ফ্রাংক ড্রাইভিং-এ সুদক্ষ। ওঁর হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং, পাশে আমি সিটের সঙ্গে বেলট দিয়ে বাঁধা, পিছনে ডাঃ বসু ও লোথার ফ্রাংক হাইডেলবার্গ রওনা হয়ে পড়লাম। এবার য়ুরোপে কি চেকোশ্লোভাকিয়া, কি জার্মানী, কি সুইজারল্যান্ড—সর্বত্র বেলটের বাঁধনে গাড়ি চড়েছি। অটোবান বা মোটরওয়ে দিয়ে যে প্রচন্ড স্পীডে গাড়ি চলে তাতে নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। আমাদের সুইস বন্ধু গিডিয়ন গাড়িতে উঠেই এয়ার হোস্টেসের গলা নকল করে বলে উঠত—"ফ্যাসেন ইওর সীট বেলট অ্যানড নো স্মোকিং প্লিজ।" অবশ্য আমার মনে হতো এরকম প্রচন্ড গতিতে গেলে সত্যিই যদি কিছু হয় তবে বেলট বাঁধা বা না বাঁধায় কিছু কি যায় আসে!

ডিটমার ও ইন্দিরা রোথারমুনডের বসবার ঘরে টেবিলের ওপর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর বুলেটিন ও জার্মান ভাষায় লেখা নেতাজীর জীবনী Der Tiger Indiens সাজানো রয়েছে দেখে ভাল লাগল। গৃহ-স্বামিনীর প্রভাবেই বোধ হয় এদের সংসারে ভারতীয় ছাপ পড়েছে অনেক জায়গায়। লাঞ্চের সময় ওঁর ভারতীয় রেকর্ড সংগ্রহ থেকে রোথারমুনড জয়া বিশ্বাসের সেতার বাজনা শোনালেন। এক সময় ঘরের কোণে রাখা একটা শাঁখ তুলে নিয়ে দু'বার ভোঁ করে বাজিয়ে দিলেন। মিসেস ফ্রাংক শঙ্খধ্বনি শুনে মুগ্ধ। এমন গম্ভীর, সুন্দর আওয়াজ কোনদিন শোনেননি। কলকাতা ফিরে গিয়ে ওঁকে একটা শাঁখ পাঠাতে হবে মনে মনে ভেবে রাখলাম।

খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে সকলে মিলে আলোচনা হল। য়ুরোপের সাউথ্ এশিয়া সংক্রান্ত স্কলার যাঁরা, তাঁরা সকলেই নেতাজী সম্পর্কে একটা নূতন আগ্রহ অনুভব করছেন দেখে উৎসাহ বোধ হয়। রোথারমুনডের বন্ধুস্থানীয় ডাঃ ফয়ট (Voigt) বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে আছেন। তিনিও নেতাজী সম্পর্কে কাজ করছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময় নেতাজীর ওপর তাঁর একটি পেপার ম্যাক্সমুলার ভবনে আমরা অনেকে শুনেছিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর য়ুরোপে যে ভূমিকা সে সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জানেন। জার্মানরা এ বিষয়ে আরো জানবেন তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৮-এর জানুয়ারী পর্যন্ত নেতাজী য়ুরোপের দেশে দেশে ভারতীয় জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের বার্তা বার বার বহন করে এনেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বছরগুলির কথা কিঞ্চিৎ অবহেলিত। রোথারমুনড তাই ফ্রাংকের কাছে এই দিনগুলির কথা শুনে চমৎকৃত হচ্ছিলেন।

লোথার ফ্রাংকের কাছে এই কাহিনী শোনার আরো একটা চমকপ্রদ দিক আছে। ফ্রাংক একজন সুস্পষ্ট হিটলার-বিরোধী। যুদ্ধের সময় হিটলার-প্রেমিক ছিলেন, অথচ যুদ্ধের পর—রাজনৈতিক উত্থানপতনের ইতিহাসে যেমন হয়েই থাকে—রাতারাতি হিটলার-বিরোধী হয়ে গেছেন এমন লোক কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রাংক তাদের দলে পড়েন না। ত্রিশের দশক থেকেই উনি ঘোরতর হিটলার-বিরোধী। যুদ্ধের গোড়ায় এ জন্য উনি জেল খেটেছেন, একবার জাহাজে করে ওঁকে নির্বাসনে পাঠানোর সময় ডেক থেকে ঝাঁপিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাঁতার কেটে পালান। সে আর এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। শেষের দিকে উনি বার্লিনে নজরবন্দী মত ছিলেন। তাই যুদ্ধের সময় নেতাজীর সঙ্গে ওঁর মাত্র কয়েক বারই সাক্ষাৎ হয় এবং প্রতিবারই গোপনে।

সেই ১৯৩৩ সালেই ফ্রাংক, নাৎসী দলের যারা ডিসিডেনট গ্রুপ বা বিদ্রোহী দল বলা যায়, তাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ করে দেন। এরা দলের ভিতর থেকে গোপন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করত। এমনি একটি গোপন সংগঠন ভারতবর্ষকে কিছু সাহায্য করতে রাজীও হয়েছিল। এর জন্য একটা "কোড" তৈরি হয়। চারটি খণ্ডে জার্মান ডিকশনারিতে এই কোডগুলি সংকলিত ছিল। নানা কারণে এই সাহায্যের প্রস্তাব বাস্তব রূপ নিতে পারেনি।

ফ্রাংকের সঙ্গে আলোচনায় এই কথাই স্পষ্ট হয় যে সুভাষচন্দ্র নাৎসী জার্মানীর চারিত্রিক শক্তি ও দুর্বলতা দুইদিক সম্বন্ধেই পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। সবকিছু জেনেশুনেই উনি যুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। হিটলার ও তাঁর গভর্নমেণ্টের সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ওঁর কোন মোহ ছিল না। তবু উনি কেন জার্মানদের সঙ্গে গেলেন? এ প্রশ্ন অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমাদের এই তথ্যানুসন্ধানী

অভিযানে ফ্রাংক, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে মূলে একটা কথা আছে তা হল এই যে, সাধারণভাবে জার্মান জাতির ওপর নেতাজীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল।

জার্মান প্রেসে এই সময় ভারত-বিরোধী প্রচার যথেষ্ট হতো। নাৎসী সরকারের সংকীর্ণ racialist দৃষ্টিভঙ্গী এর জন্য দায়ী ছিল, সুভাষচন্দ্রের এদিকে ছিল সদাসতর্ক দৃষ্টি—ক্রমাগত উনি এই ধরনের সব প্রচারের বিরোধিতা করে যেতেন। কখনো খবরকাগজে চিঠি লিখে, কখনো ফরেন অফিসের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতে। মিউনিখের জার্মান অ্যাকাডেমির ডিরেকটর ডাঃ থিয়েরফেলডার ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী এবং ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইন থেকে ডাঃ থিয়েরফেলডারকে লেখা '৩৬ সালের একটি চিঠিতে সুভাষ-চন্দ্রের ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। উনি লিখছেন—

"When I first visited Germany in 1933, I had hopes that the new German nation which had risen to a consciousness of its national strength and self-respect, would instinctively feel a deep sympathy for other nations struggling in the same direction. Today I regret I have to return to India with the conviction that the new nationalism of Germany is not only narrow and selfish but arrogant."

থিয়েরফেলডারকে উনি বলছেন যে, এরকম দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাতেও ইন্দো-জার্মান সমঝোতার জন্য চেষ্টা উনি চালিয়ে যাবেন ঠিকই—কিন্তু সে সমঝোতা আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদার মূল্যে কখনোই হবে না।

"When we are fighting the greatest empire in the world for our freedom and for our rights and when we are confident of our ultimate success, we cannot brook any insult from any other nation or any attack on our race or culture."

একই সময় কবি অমিয় চক্রবর্তী মশাইকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুদীর্ঘ এই চিঠিতে হিটলারের ভারত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে এ কথা বলেও উনি বলছেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হিটলারের ক্ষমতাচ্যুত হবার কোন লক্ষণ উনি দেখছেন না। যদি একটা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে তবেই শুধু তা হওয়া সম্ভব।

জার্মান গভর্নমেন্টের সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, কিছুতেই সুভাষ-চন্দ্র দমে যাননি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়ারী পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা, প্রাগ, ওয়ারস, বার্লিন, রোম থেকে শুরু করে লন্ডন, ডাবলিন সর্বত্র ভারতবর্ষের রোভিং অ্যামব্যাসাডর হয়ে ঘুরেছেন। সব জায়গাতেই তিনি ভারতহিতৈষী বন্ধু-গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। অস্ট্রিয়ান-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, চেকো-শ্লোভাক-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান-আইরিশ ইনডিপেনডেন্স লীগ—এই ধরনের যাবতীয় সংস্থার হয় সুভাষচন্দ্র উদ্যোক্তা, নয়ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশের সঙ্গে এই সংযোগ যে কত অমূল্য, কত প্রয়োজনীয় ছিল তা তখনকার ভারতীয় নেতারা সকলেই যে উপলব্ধি করেছিলেন তা মনে হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন জওহরলাল নেহরু, তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাহায্য যদি সুভাষচন্দ্র আর একটু পেতেন, ওঁর কাজ হয়ত সহজ হতো। বস্তুত তার বিপরীতই হয়েছিল।

ভি জে প্যাটেল তাঁর মৃত্যুকালে উইল করে সুভাষচন্দ্রকে বেশ কিছু অর্থ দিয়ে যান, নির্দেশ ছিল এ অর্থ বিদেশে ভারতবর্ষের প্রচারকার্যে ব্যয় করা হবে। সেই অর্থ থেকে সুভাষচন্দ্রকে বঞ্চিত করা হয়, সে কাহিনী সবাই জানেন।

রোথারমুনড বলছিলেন, নেতাজীর জার্মান জীবনীর নাম Der Tiger Indiens দেওয়া ঠিক হয়নি। এই জেনারেশনের জার্মানদের অর্থাৎ সাধারণ জার্মান নাগরিকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বেড়েছে বই কমেনি। The Indian Tiger —এই ধরনের বইয়ের নাম দেখলে হঠাৎ ভেবে বসবে হয়ত কোন বাঘ শিকারের কাহিনী।

সব জার্মান শহরেই যেন একটা করে কাসল্ দেখার থাকে। ইন্দিরা জোর দিতে লাগলেন, এখানকার কাসল্টা দেখে যাও। অতএব কাসল্ দেখতে যাওয়া হল। কাসল দেখে পাহাড় থেকে নেমে নেকার নদীর তীরে এলাম। সেখানে এক পুরোন গীর্জার পাশে একটা ছোটখাট কাফেতে ঢুকে কফি খাওয়া হল। ট্যুরিস্ট রীতি অনুসরণ করে পিকচার পোস্টকার্ডে সবাই নাম সই করে কলকাতায় পাঠাতেও ভুল হল না।

নেকার নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল যেন ছবিতে দেখা হাইডেলবার্গ শহর এইবার চিনতে পারলাম। হাইডেলবার্গ এখন বিরাট হয়ে গেছে। রোথারমুন-ডরা যেদিকে থাকেন, সেদিকটা আধুনিক এলাকা, আমেরিকান মিলিটারি ঘাটি সেদিকে। বড় বড় অট্টালিকা, ব্লকের পর ব্লক ফ্ল্যাট বাড়ি। কিন্তু এধারে হাইডেলবার্গের পুরনো এলাকা—সংকীর্ণ গলিপথ, দু' পাশে কাঠের খড়খড়িওয়ালা সাবেক প্যাটার্নের বাড়ি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী বয়ে চলেছে, তার ওপরে সেতু। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। একটা গান শুনেছিলাম—জার্মান গান, কথা ভাল বুঝি না—প্রথম লাইনটা ছিল এই ধরনের—

Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren— অর্থাৎ I have lost my heart in Heidelberg

যদি হৃদয় হারিয়ে থাকেন গীতিকারকে দোষ দেওয়া যায় না একটুও।

॥ নয় ॥

উইসবাডেনে একদিন কুরহাউস্ দেখতে যাওয়া হল। কার্লোভি ভারিতে নেতাজী থাকতেন একটা কুরহাউসে, বাদগাসটাইনে যে কুরহাউসে থাকতেন তার নাম কুরহাউস হকল্যান্ড। কুরহাউস ব্যাপারটা কি, আমার দেখবার শখ ছিল। কুরহাউস অনেকটা ক্লাবের মত। উইসবাডেনের এই কুরহাউসে উষ্ণজলের ঝরনা থেকে পান করার ও স্নান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কুরপার্ক বা বাগানে রয়েছে নাচ-গানের ব্যান্ড বাজাবার আয়োজন। ভিতরে আছে কনসার্ট হল, কনফারেন্সের ঘর। একদিকে বড় হলঘরে লাইব্রেরী—রিডিং রুম, কেউ সিরিয়াস পড়াশুনো করছে, কেউ বা পড়ছে খবর কাগজ। অন্যদিকে একটা বড় হলঘরে জুয়াখেলা বা গ্যাম্বল করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ফ্রাংকের মাঝে মাঝে মাথায় কি সব আইডিয়া ঢোকে। বললে, এসো গ্যাম্বল করা যাক। অনেক কষ্টে ওকে নিরস্ত করা গেল। ফ্রাংকের অন্য প্যাশন হচ্ছে যোগ ব্যায়াম করা। রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শীর্ষাসন করে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন ঘাড় ধরে বেশ কিছুক্ষণ। আমাকে রোজই এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছিলেন। মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে দীর্ঘ

বক্তৃতা দিয়ে চলেছিলেন। যোগ সম্বন্ধে ওঁকে প্রথম উৎসাহিত করেন নেতাজী, সেই থেকে উনি নিষ্ঠা সহকারে যোগ করে যাচ্ছেন।

গ্যাম্বল্ করা ও শীর্ষাসন করা, দুটোতেই আমি ফ্রাংককে নিরাশ করলাম। এবার ধরলেন, তবে সাঁতার কাটতেই হবে। ফ্রাংকদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই হবি বা বলা যেতে পারে "ফ্যাড" হল সাঁতার কাটা। উইসবাডেনে শহরের কাছেই পাহাড়ের ওপর ওপেলবাদ—চমৎকার সুইমিং পুল। তার একপাশে একটা রাশিয়ান চ্যাপেল, অতি সুন্দর সোনালী গম্বুজ। এখানে এক ডাচেসের সমাধি আছে—তিনি রাশিয়ার কোন এক জারের কন্যা না ভাইঝি। ওপেলবাদ ছাড়া ফ্রাংকরা ধরে নিয়ে গেল স্লাংগেনবাদ—অপূর্বসুন্দর প্রাকৃতিক বন্য শোভার মধ্যে মানুষের হাতের আধুনিক সুইমিং পুল। দিনটা ছিল ছুটির দিন। সেদিন বুঝলাম শুধু ফ্রাংকদের নয়, উইসবাডেন সুদ্ধ লোকের সাঁতার কাটার 'ফ্যাড' আছে। স্লাংগেনবাদের কাছাকাছি মোটরগাড়ির সুদীর্ঘ কিউ, শামুকের মত শ্লথগতিতে এক-পা করে অগ্রসর হচ্ছে যত সব প্রচণ্ড বেগবান গাড়ি।

শামুক বলতেই মনে পড়ল, উইসবাডেনের ফ্যাশনেবল সুইস্ রেস্তোরাঁ 'মুভেনপিক'-এ শামুক বা snail -এর ডিশ খুব ভাল। মিসেস্ ফ্রাংক একদিন খেতে গিয়ে অর্ডার করলেন। আমি অবশ্য ভয়ে ভয়ে সনাতন টার্কি'ই ধরে থাকলাম, ফ্রাংক পছন্দ করলেন খরগোশ। উইলহেলম্ স্ট্রাসেতে বেড়াতে বেড়াতে রিটায়ার করে উইসবাডেনে এসে বসবাস করলে কেমন হবে, ফ্রাংকের সংগে সেইরকম সিরিয়াস আলোচনা চলতে লাগল।

ফ্রাংকফুর্টের গ্যেটে হাউস একদিন দেখতে যাওয়া হল। য়ুরোপ-আমেরিকার এই লাইফ মিউজিয়মগুলি দেখলে অনেক কিছু শেখা যায়। আমাদের ভারতীয়দের ইতিহাসচেতনা সাধারণভাবেই একটু কম। ১৯৪৭ সালে যখন নেতাজী ভবনে প্রথম নেতাজীর ব্যবহৃত ঘরগুলি জনসাধারণের জন্য সুরক্ষিত করে নেতাজী মিউজিয়ামের সূত্রপাত, তখন আমাদের জাতীয় নেতাদের ওপর জীবনী-মিউজিয়াম গড়বার চেষ্টা সেই প্রথম। তার কিছুকাল পরে গান্ধী মিউজিয়ম ও আরো অনেক পরে তিনমূর্তির নেহরু-মিউজিয়ম। আজকাল আমরা আগের চাইতে অনেক বেশী ইতিহাস-সচেতন হয়েছি।

এ ব্যাপারে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মতামত অবশ্য একটু অন্যরকম ছিল। উনি কাজের মানুষ। জীর্ণ, পুরাতন কিছু পেলেই ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাইতেন। দেশবন্ধু বাসভবন ভেঙেচুরে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হয়েছে, উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে খুবই মহৎ। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের বাসভবনের ঐতিহাসিক চেহারাটি আজ আমরা তো আর দেখতে পাব-না। একবার, মনে পড়ে, কি উপলক্ষে নেতাজী ভবনে এসে বিধানবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাঁকডাক দিয়ে বলেছিলেন—ওহে, এসো এ বাড়িটা ভেঙে ফেলা যাক। ওঁকে বুঝিয়ে বলা হল এর ঐতিহাসিক চেহারা যথাসাধ্য বজায় রেখে এর সংস্কারসাধন করতে হবে, ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়।

যাই হোক, গ্যেটে ভবনে ঢুকেই চমকে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে সামনের ঘরটিতে স্বয়ং গ্যেটে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। চোখ রগড়ে আর একবার তাকালাম। ভাবলাম এও হয়ত এদের মিউজিয়ামেরই অংগ। কিন্তু তা নয়, পাশের ঘরে একটি সিনেমার ইউনিট শুটিং-এর জন্য তৈরী হচ্ছে। গ্যেটের জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী হবে একটি।

"বন-এ আমাদের জন্য ঝড় অপেক্ষা করছে, ঝড়"—বলতে বলতে ফ্রাংক আমাদের

নিয়ে উইসবাডেনে রাইন নদীর তীরে স্টীমার ঘাট থেকে জাহাজে উঠে পড়লেন। কলকাতায় আমরা একবার ফ্রাংককে নিয়ে গঙ্গায় স্টিমার-ট্রিপে গিয়েছিলাম। ফ্রাংক বললেন—তোমাদের গঙ্গার স্টীমার-ট্রিপের মতই—তবে লিটল্ মোর মডার্ন। লিটল্ মোর মডার্ন বলতে অনেকখানিই মডার্ন। আমার তো কলকাতার সেই ট্রিপের কথা মনে করে একটু লজ্জাই করতে লাগল।

উইসবাডেন থেকে বাডগোডেসবার্গ—রাইন নদীর ওপর দিয়ে এ জলযাত্রা অনেক-দিন মনে থাকবে। দু'ধারে ঘন সবুজ পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে আঙুর খেত। মাঝে মাঝে রোদ পড়ে খেতের গায়ে আয়নার টুকরোর মত কি যেন ঝকমক করে উঠছে, শুনলাম পাখি তাড়ানোর নানারকম ফাঁদ। এক এক পাহাড়ের চূড়ায় পুরোনো আমলের ভাঙা দুর্গ বা প্রাসাদের অবশেষ। জাহাজের ডেকে রঙ-বেরঙের পোশাক পরা নরনারীর মেলা। ভাঙা দুর্গের পাশ দিয়ে জাহাজ যাবার সময় যাত্রীদের মধ্যে ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় দু' পাশের দ্রষ্টব্যের উপর ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে। নদীর ধারে ছোট ছোট শহর। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মত জাহাজ টুকটুক করে থামতে থামতে চলেছে। বেশ কিছু লোক জাহাজ থেকে উঠছে বা নামছে। নদীতীর ঘেঁষে রেলের লাইন। ট্রেন চলে যাচ্ছে যাত্রী বোঝাই, আমাদের দিকে হাত নাড়ছে সবাই। বেলা যত বাড়ে যাত্রীদের মনের ফুর্তি তত বাড়ছে মনে হল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও অফুরন্ত রাইন ওয়াইন এই স্পিরিটের জন্য কতটা দায়ী তা নির্ণয় করা শক্ত।

সকালটা মিঠে রোদ্দুরে খোলা ডেকে ডেকচেয়ার পেতে বসে কাটল। মাঝে মাঝে জাহাজ তীরে ভিড়লে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছি। বিংগেন, রুডশাইম্, বাখারাখ, অবেরওয়েসেল, বোপার—কত অপরিচিত নামের বন্দর পার হয়ে চলেছি। লরেলের (Loreley) কাছে নদীর বাঁকে সব যাত্রীরা সমস্বরে গান ধরল, হাইনের বিখ্যাত এক গান। ফ্রাংক নীচু গলায় গানের ভাবটুকু আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল—সুন্দরী তার সোনালী চুলের পরিচর্যা করছে—সেদিকে চেয়ে মাঝি আর নৌকো সামাল দিতে পারছে না। St. Goar শহর পার হতে রোদ কড়া হয়ে উঠল। সকলেই উঠে একে একে ডাইনিং হল-এ আশ্রয় নিতে শুরু করল। আমরাও কাচের জানালার পাশে একটা টেবিল বেছে বসলাম। কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ধীরেসুস্থে খাওয়াদাওয়া গল্প ইত্যাদি চলতে লাগল। কফি খেতে খেতে বেলা বাজল তিনটে। ততক্ষণে আমরা কোবলেনজ (Coblenz) পেঁাছেছি। রাইন নদী আর মোসেল নদীর সঙ্গমস্থল এই কোবলেনজ।

এতক্ষণে রোদ্দুরের তেজ কমেছে মনে করে ডেকে ফিরে এলাম। রোদের তেজ কমেছে বটে, কিন্তু যাত্রীদের উচ্ছ্বাস বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। ডেকের ওপর উদ্দাম নৃত্য হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়, আকর্ডিয়ান বাজিয়ের অনেকটা আমাদের কীর্তনের খোল বাজিয়ের মত ভাবাবেগ এসেছে মনে হল। যারা নাচছে না তারা গলা ছেড়ে গান ধরেছে—গেলাস-ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে। দু'একটা গানের টুকরো মনে পড়ে—

Warum ist es am Rhein so schon—why is it so beautiful on the Rhein?

সকলেই ক্ষেপে গেছে। এক বর্ষীয়সী—তিনিও হাত নেড়ে বেশ সাধা গলায় সুন্দর গান ধরেছেন। এককালে নিশ্চয় সুগায়িকা ছিলেন। গান গাইতে গাইতে আমার কাছে এসে শাড়ির আঁচল স্পর্শ করে বললেন—জাপান, জাপান? আমি হেসে বললাম, ইন্ডিয়া। সেও হেসে বললে, ইয়া, ইয়া ইন্দিরা গান্ধী।

ডেকের বাইরে চোখ ফেরালে প্রকৃতির তখন অন্য চেহারা। সূর্যদেব পাটে বসছেন, আকাশের একদিকে রক্তিম আভা। নদীর জলে তারই প্রতিফলন। কোবলেনজের পর নদীর দুধারে পাহাড়-পর্বত আর বিশেষ দেখা যায় না, সমতল। মাঝে মাঝে ছোটখাট পাহাড় দু'একটা যা চোখে পড়ছে, ক্ষীয়মান দিনের আলোয় তাদের রঙ দেখাচ্ছে কালচে সবুজ।

সাড়ে চারটা নাগাদ বাডগোডেসবার্গ পৌঁছে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কোবলেনজেই শুনলাম আমরা ঘণ্টা দেড়েক লেট চলেছি। ফ্রাংক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বন-এর প্রোগ্রামে লেখা আছে—জাহাজ থেকে নেমে দু' ঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর কাজ শুরু। ফ্রাংক বললে—দেখলে, বিশ্রামের দু ঘণ্টা কাটা গেল, গিয়েই ঝড় শুরু হয়ে যাবে। আমার অবশ্য এই 'ড্রাকেনফেলস' জাহাজে বাড়তি দুঘণ্টা কাটাবার প্রস্তাব ভালই লাগল।

ধীরে ধীরে নীচের ডেকে নেমে এসে দাঁড়ালাম। বাডগোডেসবার্গের ঠিক আগে কয়নিগসউইণ্টার-এ অল্পক্ষণের জন্য জাহাজ ভিড়েছে। অল্প কিছু লোক নামছে। আমার চোখ পড়ল একটি দম্পতির ওপর—সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, ভদ্রলোকটি বিদায় নিয়ে নেমে যাচ্ছেন। এক একবার কিছুদূর গিয়েও আবার ফিরে আসছেন। বিদায় নিতে মন যেন চাইছে না, খুবই করুণ, অন্তরঙ্গ বিদায় দৃশ্য। মনে হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদ ভাবনায় দুজনেই কাতর। অনর্গল জার্মান ভাষায় দুজনে কি বলছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তবুও আমার চোখ সজল হয়ে আসছিল। এমন সময় ফ্রাংক আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে—এদের দুজনের এই জাহাজের ডেকেই প্রথম দেখা ও পরিচয় এবং এই সম্ভবত শেষ, কারণ দুজনেরই যার যার ঘর-সংসার আছে। আজকের এই জার্নি পরস্পরের সান্নিধ্যে খুব মধুর কেটেছে—এই কথা বলে দুজনে বিদায় নিচ্ছে। আমি যদিও মুখের ভাব নির্বিকার করে রেখেছিলাম, তবুও ফ্রাংকের কি মনে হল, একটু হেসে বললে, কলকাতায় তুমি অনেক বেঙ্গলী লাইফের নমুনা আমাকে দেখিয়েছ, তা আজকে এই জলযাত্রায় তুমিও কিছু জার্মান লাইফ দেখবার সুযোগ পেলে।

একটা বিরাট সাদা অট্টালিকার পাশ দিয়ে তীর ঘেঁষে আমাদের স্টীমার চলেছে। ফ্রাংক আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—ওই হোটেলে আমরা উঠব। বড় বড় করে লেখা চোখে পড়ল—হোটেল ড্রেজেন।

হোটেল ড্রেজেন সকলেই বলে হিটলারের হোটেল। হিটলার যখনই বন-এ আসতেন তখন এই হোটেলে থাকতেন। রাইন নদীর তীরে এই সুরম্য হোটেল হিটলারের প্রিয় ছিল। এ কথা শুনে আমরা কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত হলাম, যখন শুনলাম হোটেলের ব্যাংকোয়েট হল-এ যেখানে নেতাজী সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে, সেখানে হিটলারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতো। হোটেলের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়ালে যতদূর দেখা যায়, চোখে পড়ে রাইন নদী বয়ে চলেছে। অবশ্য সে দৃশ্য যে ক'দিন ছিলাম উপভোগ করতে সময় পাইনি এক মুহূর্তেও। মূল সম্মেলন ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে এমনি ঠাসা প্রোগ্রাম ছিল।

হোটেল ড্রেজেন পার হলে অল্পক্ষণের ভিতর বাডগোডেসবার্গ স্টীমার ঘাটায় তরী ভিড়ল। দূর থেকেই পারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভীড়ে ডাঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থকে চোখে পড়ল। আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে ব্যস্তসমস্তভাবে ডাঃ ওয়ার্থ বললেন, মুখ-হাত ধুতে, আর পোশাক বদলাতে আধ ঘণ্টা সময় দিতে

পারি, মিসেস বোস, তার বেশী নয়। ভয়ানক লেট হয়েছে তোমাদের, সমস্ত কাজ অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য। ফ্রাংক আমার দিকে চোখ টিপলে, ভাবখানা এই—আগেই বলেছিলাম কিনা, বন-এ ঝড় অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য, ঝড়।

॥ দশ ॥

বন-এ নেতাজী সম্মেলনের প্রাণপুরুষ হলেন ডাঃ আলেকজান্ডার ওয়ার্থ। সত্যি কথা বলতে কি, এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসেবে ওয়ার্থের চাইতে যোগ্যতর কাউকে ভাবাই যায় না। ১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে "অরল্যান্ডো মাৎসোটা"-বেশী সুভাষচন্দ্র যেদিন বার্লিনে পা দিলেন সেদিন থেকে শুরু করে ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে সাবমেরিনে জাপানযাত্রা করার দিন পর্যন্ত ওয়ার্থ নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়া এই সম্মেলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত eutsche-Indische Gesellschaft বা জার্মান-ভারত অ্যাসোসিয়েশনের বন এলাকার ওয়ার্থই হলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান।

১৯৪১—৪৪ সাল যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি আলেকজান্ডার ওয়ার্থ জার্মান ফরেন অফিসের স্পেশাল ইন্ডিয়া ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আগে কিছুদিন ছিলেন ব্রিটিশ-আমেরিকান বিভাগে। তখনো ব্রিটিশ এলাকা হিসেবে ভারতবর্ষ ওঁর কাজের এক্তিয়ারেই ছিল।

নেতাজীকে তখনো ওয়ার্থ চোখে দেখেননি। কিন্তু যেদিন কাবুলের জার্মান ও ইটালিয়ান দূতাবাসের কাছ থেকে বার্লিনের ফরেন অফিসে নেতাজীর কাবুলে উপস্থিতির খবর এল, সেদিন থেকেই ওয়ার্থ য়ুরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। জার্মান ও ইটালিয়ান ফরেন অফিস তখন একযোগে "অরল্যান্ডো মাৎসোটা পরিকল্পনা" রচনায় হাত লাগিয়েছেন। টপ সিক্রেট এই পরিকল্পনার রূপায়ণে জার্মান ফরেন অফিসের অল্প যে ক'জন অফিসার ছিলেন, ওয়ার্থ তাদের মধ্যে অন্যতম।

অ্যাডাম ফন ট্রট্ ছিলেন স্পেশাল ইন্ডিয়া ডিভিশনের প্রধান, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ তাঁর সহকারী। ট্রটের কথা বলতে আলেকজান্ডার ওয়ার্থের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধা ও বেদনায় আপ্লুত হয়ে যায়। অ্যাডাম ফন ট্রট ও নেতাজীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। নাৎসী জার্মানীতে নেতাজীকে প্রতি পদক্ষেপে অনেক বাধা ঠেলে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু নেতাজীর ভাগ্য ভাল যে অ্যাডাম ফন ট্রটের মত উদারচেতা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অফিসার স্পেশাল ইন্ডিয়া ডিভিশনের প্রধান ছিলেন।

অপরদিকে নেতাজী যখন বার্লিনে এসে পৌঁছলেন এবং ঘন ঘন ওদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল, তখন ট্রট ও ওয়ার্থ নেতাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দেশের জন্য আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যত দিন যায় ফরেন অফিসের আরো অনেকে ট্রট ও ওয়ার্থের মত নেতাজীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়ে তাঁর মতামত ও কার্যধারার পূর্ণ সমর্থক হয়ে পড়লেন। একজনকেই নেতাজী বিশেষ টলাতে পারেননি বা বলা যায় তার সুযোগ পাননি। তিনি চ্যান্সেলর হিটলার।

হিটলারের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ট্রট্ গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৪-এর ২৬শে আগস্ট তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। দুঃস্বপ্নের

মত সেই দিনগুলিতে আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ ট্রটের স্ত্রী ক্লারিটা ফন ট্রট ও দুটি শিশুকন্যার পাশে পাশে ছিলেন। অবশ্য ওয়ার্থ যখন বার্লিনে ক্লারিটার সঙ্গে ট্রটের অন্তত একটা শেষ সাক্ষাতের চেষ্টা করছেন সে সময় ওদের ইমস্-হাউসেনের বাড়ি থেকে নাৎসীরা শিশুদুটিকে নিয়ে চলে যায়। হিটলার সে সময় 'Sippenhalt' নামে এক নীতি চালু করেন, তাতে ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট-আত্মীয়দের ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হতো। শিশু দুটির বয়স তখন একজনের আড়াই বছর আর একজনের ন' মাস, ভাবা যায়? ক্লারিটাও বন্দী হলেন। শিশু দুটি অবশ্য প্রাণে বেঁচে যায়। ওয়ার্থ যখন 'নেতাজী অরেশন'-এর বক্তা হিসেবে কলকাতায় আসেন তখন তিনি বলেছিলেন, আজ ফন্ ট্রট্ বেঁচে থাকলে এই বক্তৃতা তারই দেবার কথা। ট্রটের অবর্তমানে য়ুরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মধ্যে ওয়ার্থ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলছিলাম, পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন শহরে নেতাজী সম্মেলনের উদ্যোক্তার পদ ওয়ার্থ ছাড়া আর কে নিতে পারত?

বন বাডগোডেসবার্গে যেদিন পেঁছিলাম সেদিন রাত্রেই ওয়ার্থের বাড়িতে এক ডিনারে সবাই মিলিত হলাম। ওয়ার্থের বাড়ি দেখে আমি মুগ্ধ। বাডগোডেসবার্গ এমনিতেই অভিজাত ও ফ্যাসনেবল্ এলাকা। কিন্তু তার মধ্যেও ওয়ার্থের বাড়িটি দর্শনীয়। রাইন নদীর দু'ধারে অনেক পুরোন কাসল্ দেখতে দেখতে এসেছিলাম—ওয়ার্থের বাড়ি বলা যায় একটি মডার্ন কাসল্। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে ওয়ার্থ জীবন কাটিয়েছেন, '৪৫ থেকে '৪৮ সাল রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী হিসেবেও জীবন কেটেছে। কিন্তু ভাগ্যদেবী পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হাসি হেসেছেন। নিজের কর্মজীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। মিসেস ওয়ার্থ ও তিনটি সুন্দরী কিশোরী কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। মিসেস ওয়ার্থ একটি লাল টুকটুকে বেনারসী শাড়ি কেটেকুটে ইভনিং ড্রেস বানিয়েছেন—তাই পরে ডিনারের তদারক করছেন। এ আমাদের ওয়েডিং ড্রেস, বিয়ের শাড়ি শুনে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হলেন। ওদের বাড়ির পিছনে বিরাট লন্, তার একপাশে সুইমিং পুল, অন্যদিকে সামার গার্ডেন। এই বিরাট বাড়ি ও সবকিছু দেখাশুনো করার জন্য আধডজন পরিচারক-পরিচারিকা চোখে পড়ল—যা কিনা য়ুরোপে অভাবনীয়। ওদের ড্রাইভার হের অ্যালবার্ট একজন পিংপং চ্যাম্পিয়ান। সকলেই রসিকতা করছে, ওকে এবার চীনে পাঠিয়ে দেবে।

খাওয়ার সময় মেয়েরাই পরিবেশন করলে। টেবিলে বসে ফর্ম্যাল ডিনার খাওয়া হল, প্রত্যেকের জন্য আলাদা ছবি আঁকা মেনু কার্ড। ডাঃ ওয়ার্থ হাতের শ্যাম্পেনের গেলাসে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছেন আর পরের কয়েকদিনের কর্মসূচী নিয়ে অনর্গল আলোচনা করে চলেছেন। ডাঃ বসুর দিকে ফিরে বললেন, 'প্রেস কনফারেনসের সময় একটু সামলে নিও। যদিও আমাদের সম্মেলন বিশেষভাবে নেতাজী সম্পর্কে, তবুও তুমি কলকাতা থেকে আসছ, তোমাকে রিপোর্টাররা ঠিক বাংলাদেশের কথা নিয়ে চেপে ধরবে।'

তখন সেপ্টেম্বরের শেষ, বাংলাদেশ তখন সকলের মুখে মুখে। বিদেশে সবাই প্রশ্ন করছে, তোমাদের যুদ্ধটা কবে বাঁধবে? মনে মনে আমরাও শংকিত হচ্ছি দেশে ফিরবার আগেই হঠাৎ যুদ্ধ বেঁধে যাবে না তো!

আমাকে ওয়ার্থ উপদেশ দিচ্ছিলেন কি করে একটি প্রধানত মহিলা সভা—যদিও পুরুষ শ্রোতাও কিছু কিছু থাকবেন—সামলে নিতে হবে। সেখানে আমাকে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে এবং প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হবে। সেদিনকার ডিনার পর্ব শেষ

হয়েছিল ফ্রাংকের শীর্ষাসন দিয়ে। উপস্থিত অভ্যাগতদের সামনে ওয়ার্থের বসবার ঘরে কার্পেটের ওপর মাথা রেখে ফ্রাংক শীর্ষাসনের একটা ডেমনস্ট্রেশন্ দিয়ে দিলে।

য়ুরোপে নেতাজীর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে নাম্বিয়ার, শর্মা বা ফ্রাংকের সঙ্গে যেমন দীর্ঘ, নিভৃত আলোচনার অবকাশ হয়েছিল—বন-এ এসে ডাঃ ওয়ার্থের সঙ্গে দিনের প্রায় চব্বিশঘণ্টাই একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সে অবসর কিছুতেই হল না। ওয়ার্থের সঙ্গে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সেই দিনগুলির কথা সবই হতো মোটরগাড়িতে বসে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে যেতে। অবশ্য মূল সম্মেলনের দিনে বক্তৃতায় ডাঃ ওয়ার্থ তার বক্তব্য পেশ করেছিলেন। খাবার টেবিলে খেতে খেতেও যে কথা হবে তারও বিশেষ উপায় ছিল না, কারণ বেশীর ভাগ জায়গায় অনেক নিমন্ত্রিত উপস্থিত থাকছিলেন। বন-এ বাংলাদেশও আমাদের যথেষ্ট সময় নিচ্ছিল। যেমন, আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে যেদিন লাঞ্চ দেওয়া হল সেদিন দূতাবাসের অফিসাররা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা মিলে বাংলাদেশের সমস্যার আলোচনায় অনেক সময় কাটাল। আমরাও দেশের খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। দূতাবাস থেকেই টাটকা খবর পেতাম, দেশের খবরের কাগজ দেখতে পেতাম।

এর মধ্যে একদিন বন রেডিও স্টেশন থেকে আমাদের নিতে এল। যে জার্নালিস্ট বন্ধুটি এলেন তাঁর গাড়িটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। খুব ছোট্ট, একটি মিনি গাড়ি, বোধ হয় ফরাসী। তার অবস্থা আবার খুব জরাজীর্ণ। হোটেল ড্রেজেন থেকে আমাদের গাড়িতে তুলতে তুলতে জার্নালিস্ট বন্ধুটি বললেন, সরি, এই বিখ্যাত হিটলারের হোটেলের সঙ্গে আমার গাড়িটা মোটেই খাপ খাচ্ছে না।

বন রেডিও বাংলাদেশের ওপর ডাঃ বসুকে ইন্টারভিউ করলে। প্রশ্ন অনেক বিচিত্র ছিল। সীমান্তের কাছে নেতাজীর নামে যে ফিল্ড হাসপাতালটি কাজ করছে সেখানকার আহতদের সমস্যা থেকে শুরু করে 'রাজনৈতিক সমাধান' কথাটা বলতে কি বোঝায়, ইয়াহিয়া তো সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন শরণার্থীদের, তবু তারা ফিরছে না কেন, ইত্যাদি। বন রেডিওর সাংবাদিক বন্ধুটি পরে বাংলাদেশের ব্যাপারেই কলকাতা আসেন। তিনি বললেন, এই ইন্টারভিউ প্রচারিত হবার পর পাকিস্তান এমব্যাসি থেকে বন রেডিওতে কড়া প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। শুনে আমরা কৌতুক বোধ করেছিলাম।

ডাঃ ওয়ার্থের সঙ্গে নিভৃতে একটি মাত্র লাঞ্চ আমরা খেয়েছিলাম সিসিলিয়েন—বা ওই ধরনের নামবিশিষ্ট একটি সুন্দর ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয়। পাহাড়ের ওপর এমন জায়গায় এটি অবস্থিত যে খেতে খেতে কাঁচের জানলা দিয়ে প্রায় সমস্ত বন শহরের একটা ভিউ দেখতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট ইটালিয়ান খাদ্য ও রকমারী চীজ্ এবং কড়া কফি খেতে খেতে ওয়ার্থের সঙ্গে সেদিন কিছু কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল।

নেতাজী বার্লিনে এসে পৌঁছনোর পর ১৯৪১-এর বসন্তকালেই কর্মব্যস্ততা শুরু হল। তিনদিক থেকে নেতাজী সংগঠনে হাত দিলেন। প্রথম, ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টার গড়ে তুলে সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের জড়ো করলেন, তারপর আজাদ হিন্দ রেডিও সংগঠিত হল। সুগঠিত প্রচারযন্ত্র কত শক্তিশালী হতে পারে সে সম্পর্কে নেতাজীর মনে কোন সংশয় ছিল না।

জার্মান আর্কাইভাস-এর দলিলপত্রের মধ্যে এক জায়গায় দেখতে পাই, নেতাজী হিন্দু রেডিও সংগঠিত হল। সুগঠিত প্রচারযন্ত্র কত শক্তিশালী হতে পারে সে জয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়।

এছাড়া ইন্ডিয়ান লিজিয়ন বা মুক্তিবাহিনী ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে

নিয়ে গঠন করার কাজ তো চলছিলই। এই কথাগুলো শুনতে যত সহজ শোনাচ্ছে, কাজে মোটেই তত সহজ হয়নি। তবে অ্যাডাম ফন্ ট্রট ও স্টেট সেক্রেটারী উইলহেলম্ কেপলার আপ্রাণ সহযোগিতা করে গেছেন। এইসব দিনগুলিতে নেতাজীর সব কাজে নাম্বিয়ার ও ওয়ার্থ তাঁর নিত্য সহচর হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নেতাজীর চারপাশে গনপুলে, ভিয়াস, আবিদ হাসান, গিরিজা মুখার্জি প্রভৃতিও তখন জড়ো হচ্ছেন।

॥ এগার ॥

নেতাজী চাইছিলেন জার্মানী, ইটালী ও জাপান একটি যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী এই ধরনের একটি ঘোষণা আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা সম্পর্কে করেছিল। ইটালিয়ান গভর্নমেণ্ট নেতাজীর এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, কারণ মুসোলিনি ছিলেন বরাবরই নেতাজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। জাপানকে নিয়েও কোন অসুবিধা হল না। জার্মানীতে সে সময় জাপানের অ্যামবাসাডর ছিলেন ওসীমা ও মিলিটারি এ্যাটাচে ইয়ামামোটো। এরা দু'জনেই নেতাজীর গভীর দেশপ্রেম ও অসাধারণ কর্ম-ক্ষমতায় মুগ্ধ ছিলেন। এদের সঙ্গে নেতাজী সরাসরি আলোচনা চালাবার পর জাপান গভর্নমেণ্ট যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে স্বীকৃত হল।

এই ঘোষণার ড্রাফট্ ১৯৪২-এর ১০ই জানুয়ারী লেখা হয়েছিল। জার্মান আর্কাইভস্-এর কাগজপত্র দেখলে বোঝা যায় এমনভাবে ঘোষণাটি তৈরি করা হচ্ছিল যাতে ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসে এই বিবৃতি প্রচার করা যায়।

ওয়ারমান নোট তৈরি করেছেন হিটলারের জন্য, তাতে লিখছেন, নেতাজীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই ড্রাফট্ তৈরি হয়েছে, অবশ্য ও'র সব সাজেশনই যে গ্রহণ করা হয়েছে তা নয়। যেমন উনি বলছিলেন, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে 'রিলিজিয়ন ও ক্লাস'—ধর্ম ও শ্রেণীর বৈষম্য থাকবে না এমনি কথা এখানে থাকুক। কিন্তু ওসব কথা এখানে তোলা হয়নি।

ইটালিয়ান ও জার্মান গভর্নমেণ্ট স্বীকার করলে কি হবে, স্বীকৃত হলেন না হিটলার। একাধিক ড্রাফট্ লেখা হয়েছিল। তার একটির তারিখ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২। কিন্তু হিটলারের আপত্তির জন্য কিছু করা সম্ভব হল না। ঠিক কি কারণে তাঁর আপত্তি জানা যায় না—তবে কৈফিয়ত ছিল এই যে—এ-ধরনের ঘোষণার এখনো সময় আসেনি। অতএব অনেক চেষ্টা করেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংক্রান্ত একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ সম্ভব হল না। নেতাজীকে নিরাশ হতে হল।

অবশ্য পূর্ব এশিয়ায় যখন আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়, তখন সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিতে জার্মানী ইতস্তত করেনি একটুও।

নেতাজী ও হিটলারের একমাত্র সাক্ষাৎকারটি সম্ভব হল ১৯৪২-এর ২৮শে মে। ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই হয়নি। মুসোলিনির সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক কিন্তু হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। মুসোলিনি সহজে দেখা করতেন, হিটলারের দেখা পাওয়া কঠিন ছিল। নেতাজী সাধারণত কাজের সূত্রে সব প্রয়োজনে দেখা করতেন ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপের সঙ্গে। সরাসরি দেখা করার প্রয়োজন না থাকলে অ্যাডাম ফন্ ট্রট বা পলিটিক্যাল ডিভি-

শনের ডাঃ উলরিশ বা ডাঃ মেলচারস (ইনি পরে স্বাধীন ভারতবর্ষে জার্মান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন)—এ'রা কাজ চালিয়ে দিতেন।

হিটলারের সংগে এই সাক্ষাৎকার বিশেষ সফল হয়নি বলেই সকলে বলে। এই সাক্ষাৎকারের সময় হিটলারের সংগে ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপ এবং হিমলার ছিলেন এবং নেতাজীর সংগে ছিলেন স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের অ্যাডাম ফন্ ট্রট ও স্টেট সেক্রেটারি কেপলার। হিটলারের দোভাষী স্মিডথ্ তো ছিলেনই।

ওয়ার্থ এই সাক্ষাৎকারের একটি গল্প বলেন, খুব সম্ভবত ট্রটের কাছে শুনে-ছিলেন। 'রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা' বলতে তিনি কি বোঝেন—এই রকম কি একটা প্রশ্ন হিটলার করলে পর নেতাজী বিরক্ত হয়ে ট্রটের দিকে ফিরে বলেন—'হিজ এক্সেলেন্সিকে বলুন, আমি সারাজীবন রাজনীতি করে আসছি, এ সম্বন্ধে আমার অন্য লোকের পরামর্শ দরকার নেই।' ট্রট এই মন্তব্য যথাসাধ্য নরম করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে হিটলারকে বলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ নেতাজীর মুখ থেকে শোনেন নাম্বিয়ার। তিনি অবশ্য এই ধরনের মন্তব্যের কথা স্মরণ করতে পারলেন না। নাম্বিয়ারের ধারণা, যত বিরক্তই হন, নেতাজী আনডিপ্লোমেটিক কোন কাজ সহজে করবেন না। সে জায়গায় হিটলারের প্রতি অত রূঢ় হওয়া বেশ একটু আশ্চর্য।

হিটলার ও নেতাজীর এই সামিট মিটিং-এ কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য না হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতাজী ১৯৪১-এর মে মাস থেকেই অর্থাৎ এই সাক্ষাৎকারের এক বছর আগে থেকেই কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন। ১৯৪১-এর নভেম্বরে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বার্লিনে রীতিমত কাজ শুরু করে দিয়েছিল। বার্লিনের টিয়েরগার্টেন এলাকায় লিখটেন্স্টাইন আলেতে এদের দপ্তর হল, জন পঁয়ত্রিশ ভারতীয়কে নিয়ে কাজ শুরু হল। রেডিওর কাজ চালু রাখা, "আজাদ হিন্দ" পত্রিকা সম্পাদনা, তা ছাড়া স্বাধীন ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের জন্য প্ল্যানিং কমিটির কাজ চালানো—কাজের অন্ত ছিল না। নেতাজী তাঁর ডেপুটি হিসেবে নাম্বিয়ারকে মনোনয়ন করেন।

নেতাজীর মোটের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। যুদ্ধের সময়ের একটি স্পেশ্যাল ফাণ্ড থেকে ও'কে টাকা ধার দেওয়া হতো ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের জন্য। ধার হিসেবেই উনি তা নিতেন এবং ধার শোধ শুরুও হয়েছিল। উনি ডিপ্লোমেটিক স্টেটাসও পেয়েছিলেন, অন্যান্য ডিপ্লোমেটিক মিশন, যেমন জাপান ও ইটালীর মিশনগুলির সংগে উনি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতেন। ওঁর সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়ি সর্বদা কর্মচঞ্চল হয়ে থাকত।

নেতাজী ক্যাম্প আনাবুরগ-এ ইণ্ডিয়ান লিজিয়নকে দেখতে গিয়েছিলেন '৪১-এর ডিসেম্বরে। যদিও অন্যান্য সব যুদ্ধবন্দীদের জার্মানরা লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল। কিন্তু যেসব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়নি তাদের কিন্তু কখনো লেবার ক্যাম্পে যেতে হয়নি। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের ছত্রছায়ায় এরা ভালই ছিল।

আজাদ হিন্দ রেডিওর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল অক্টোবর মাসেই। জন কুড়ি অত্যন্ত সুদক্ষ ভারতীয় কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রেডিও চালু করা হয়। জার্মানরা শুধু টেকনিক্যাল সাহায্য করত। '৪৩ সালের গ্রীষ্মে ইংরেজ ও আমেরিকা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু করলে পর বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ রেডিও সরিয়ে হল্যাণ্ডের হিলভারসাম নিয়ে যাওয়া হল। '৪৪ সালে আইসেনহাওয়ার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ফ্রান্সে নামলেন। তখন আবার আজাদ হিন্দ রেডিও জার্মানীতে

ফিরে এল। এবার এল হেলম্স্টেড শহরে আর '৪৫ সালের গোড়ার দিকেও এখান থেকে কাজ চালিয়ে গেছে। হেলম্স্টেড এখন হল পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সীমানায়। যুদ্ধ যখন সেখানেও পেঁছে গেল তখন এই কুড়িজনের রেডিও টীম, যা ঐকান্তিক ভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছে—সেই টীম দল ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

শেষ পর্যন্ত স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের একমাত্র ওয়ার্থ-ই ছিলেন বার্লিনে। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে ওয়ার্থ ও জার্মান পলিটিক্যাল আর্কাইভস্-এর প্রধান ডাঃ উলরিশ রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হলেন।

ডাঃ ওয়ার্থের সঙ্গে আমরা বন-এর জার্মান ফরেন অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে যাকে বলে 'কল অন' করলাম বা সাক্ষাৎ করলাম। এখন সাউথ এশিয়া ডিপার্টমেন্টের যিনি প্রধান—হের বেরেনডংকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ফরেন অফিসের বিরাট বাড়ির এক তলায় গিয়ে যখন রিপোর্ট করলাম তখন মনে হল বার্লিনের সেদিনকার ফরেন অফিস ও আজ বন-এর ফরেন অফিস—চেহারা, চরিত্র সবেতেই অনেক তফাত। তবুও এই ফরেন অফিসেরই পূর্বসূরী একদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনেক করেছিল, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল নেতাজীর প্রতি।

ওয়ার্থ বলছিলেন, নেতাজী খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এই যুদ্ধে তিনি জার্মানীর সাহায্যপ্রার্থী, কেননা জার্মানী আজ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত। জার্মানীর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ বা য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোন কিছুতে নেতাজীর ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার জড়িত হবে না। ফরেন অফিস নেতাজীর এই মূল বক্তব্য মেনে নিয়েছিল।

বেরেনডংকের সেক্রেটারি একটি মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা করতে নীচে নেমে এলেন। একপাশে এক লাইন 'মুভিং লিফট' উঠছে-নামছে। আমার শাড়ির দিকে এক নজর চেয়ে উনি বললেন—না, তুমি ওটাতে উঠতে পারবে না। অতএব ট্র্যাডিশনাল লিফটে চড়ে বেরেনডংকের ঘরে হাজির হলাম। কফির সরঞ্জাম টেবিলে সাজিয়ে বেরেনডংক বসে আছেন। আমরা ঢুকতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে ডাঃ বসুকে বললেন—আপনার অল্প বয়সের ছবি আমাদের দপ্তরে রয়েছে। একটু মুচকে হেসে বললেন—মনে পড়ে? ১৯৪১-এর ১৬-১৭ই জানুয়ারীর রাত্রি? একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা, তাই নয়?

বেরেনডংকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, নেতাজীর অন্তর্ধান থেকে শুরু করে পুরো জার্মান পর্ব ও ইস্ট এশিয়া পর্ব সম্বন্ধে উনি ওয়াকিবহাল। সে সময়েও ইনি ফরেন অফিসে ছিলেন, না বর্তমানে এর প্রধান হিসেবে এত সব খবরাখবর জেনে বসে আছেন এটা আমার কাছে স্পষ্ট হল না। বেরেনডংকের সঙ্গে মূল্যবান আলোচনা হল। এর আগেও জার্মান ফরেন অফিস নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর জন্য তাদের আর্কাইভস্-এর দরজা খুলে দিয়েছে।

আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও নির্দেশ দিয়েছিলেন নেতাজী-সংক্রান্ত সব তথ্য যেন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে আসে। তারপর বহু নূতন তথ্য যোগ হয়ে থাকবে আর্কাইভস্-এ। যখনি প্রয়োজন হবে ফরেন অফিস সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলে। পরদিনই যাতে আমরা পলিটিক্যাল আর্কাভাইস্ পরিদর্শন করতে পারি, বেরেনডংক তার ব্যবস্থাও করে দিলেন।

শুধু যে অতীত নিয়ে কথা হল তাই নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতও ছিল। কথায় কথায় আমি বললাম, বন-এ এসে আমি একটু হতাশ হয়েছি। বেশ সুন্দর শহর,

তবে রাজধানী হিসেবে যেন কেমন। বিশেষ করে বার্লিন থেকে এলে আরো তফাত চোখে পড়ে। ফরেন অফিসের এ'রা বললেন—দেখো, আমরা কোনদিন ভাবিনি বন-এ আমাদের চিরস্থায়ী রাজধানী হবে, একদিন-না-একদিন বার্লিনে ফিরে যাওয়া হবে এমনি আশা ছিল। তাই বহুদিন গভর্ণমেণ্টের একটা বাড়ি পর্যন্ত বানানো হয়নি। সতেরোটি ভাড়া বাড়িতে গভর্ণমেণ্টের অপিস ছিল। আজ এতদিন বাদে কয়েকটা নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়েছে—এই ফরেন অফিস তেমনি একটি নূতন বাড়িতে। এখন বন-এ এয়ারপোর্ট খুব সুন্দর আধুনিক। কিন্তু বেরেনডংক বললেন, কিছুকাল আগেও বিমানবন্দরে শুধু একটা ব্যারাক মত ছিল—ভি আই পি-রা এলে সেখানেই নামাতে হতো।

তখন শীগগিরই ইন্দিরা গান্ধী আসবেন বন-এ, কোথায় তাঁকে রাখা হবে সেই আলোচনা চলছে। আগে ভি আই পি-রা এলে রাইন নদীর অপর পারে পাহাড়ের চূড়ায় যে প্রাসাদ আছে সেখানে রাখা হতো। এখন সে প্রাসাদের সেণ্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে গ্রীসের রাজা ও রাণীকে সেখানে রেখে এরা তো অপ্রস্তুত। রাজা-রাণীর শীতে জমে যাবার উপক্রম। মিসেস গান্ধীর জন্য শহরের ভিতরেই কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে। চলে আসার সময় বেরেনডংক বললেন—ও বেলা আবার দেখা হবে, আমি বিকেলে তোমাদের সম্মেলনে যোগ দিতে আসছি।

॥ বারো ॥

সেদিন বিকেল চারটা থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত নেতাজী সম্মেলনের মূল আলোচনা সভা বসেছিল। আলোচনা, বক্তৃতা, খানা-পিনা, ফিলম-শো, সাংবাদিক সম্মেলন সব কিছু মিলে জমজমাট ব্যাপার। হোটেল ড্রেজেনের ব্যাংকোয়েট হল-এ প্রধান আলোচনার আসর বসল। বিকেলে ব্যাংকোয়েট হল-এর লাগোয়া বারান্দায় একটা tea-meeting দিয়ে কাজ শুরু হল। এই সেই মিটিং বা সামলাবার ভার ডাঃ ওয়ার্থ আমার ওপর দিয়েছিলেন।

এই ছোট্ট মিটিং-এ সকলেই খুব উৎসাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিল। কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, ভারতীয় মেয়েরা সাধারণভাবে রাজনীতি-সচেতন। আমার শ্রোতাদের এ মন্তব্যে কারো কারো আপত্তি হল। তারা বললে—'তা কি করে হবে? তোমাদের দেশের মেয়েরা বেশীর ভাগই হল আনএডুকেটেড, ইললিটারেট —অশিক্ষিত, অক্ষর-পরিচয়হীন। মানছি তোমাদের ইন্দিরা গান্ধী আছেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন মহিলা এবং বিচক্ষণ রাজনীতিক। কিন্তু তারপরেই তো অন্ধকার, একটা বিরাট গ্যাপ, যার অপরদিকে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ভারতীয় নারী।

এ সব কথা বিদেশে বসে শুনতে কার ভাল লাগে? অতএব আমিও আমার পয়েণ্ট কিছুতেই ছাড়ি না। শুধু অক্ষর পরিচয় থাকলেই কি শিক্ষিত বলা চলে? আমাদের নিরক্ষর ঠাকুমা-দিদিমাদের কাণ্ডজ্ঞান আমাদের চাইতে ঢের বেশী ছিল না কি? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাদের রাজনীতিক চেতনার মূলে হয়ত আছে সেইসব দিনগুলি। আর কিছু নয়, শ্রোতাদের কাছে অন্তত সাম্প্রতিক দুটো নির্বাচনের অভিজ্ঞতার গল্প করি। ১৯৬৭ সালে গ্রাম-বাংলায় নির্বাচন দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সাধারণ, গ্রাম্য চাষী বউ-ঝিরা সকাল সকাল রান্নাবান্না শেষ

করে ভোট দিতে এসেছে। সেবারের নির্বাচনে একটা বড় রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়েছিল। মেয়েরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এই অধিকার প্রয়োগ করে যে তারা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তারা সেটা বেশ ভালই বোঝে দেখা গেল। ১৯৭১-এ কলকাতায় যখন সন্ত্রাসের রাজত্ব তখন আর একটা নির্বাচন হল। লোকে ভেবেছিল ভয়ে কেউ ভোট দিতে যাবে না, প্রচন্ড গোলমালের আশংকা ছিল। ভোটের দিন ভোর হতে-না-হতেই দেখা গেল শহরের মেয়েরা লাইনে দাঁড়িয়ে গেছেন সকলের আগে।

আমাদের মিটিং চলতে চলতেই অন্য ঘরে ডাঃ বসুর সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হল। য়ুরোপে নেতাজী গবেষণা এবং বাংলাদেশ এই দুই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন হয়েছিল বলে শুনলাম। মিটিং শেষ করে লাউঞ্জে এসে দেখি অতিথি-অভ্যাগত সমাগমে ঘর ভরে গেছে। আরো সকলে একে একে আসছেন।

ডাঃ ওয়ার্থ সমবেত সকলকে রিসেপশন দিচ্ছিলেন। ডাঃ ওয়ার্থের রিসেপশন শ্যাম্পেন ছাড়া অকল্পনীয়। অতএব অরেঞ্জ অ্যান্ড শ্যাম্পেন সার্ভ করা হচ্ছে। বন-এ ভারতীয় দূতাবাসের প্রায় সকলে উপস্থিত মনে হল। কিন্তু রাষ্ট্রদূত কেবল সিংকে অকস্মাৎ ফ্রাংকফুর্ট চলে যেতে হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং নিউ ইয়র্কে ইউ এন ও-তে যোগ দিতে যাবার পথে ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দরে কয়েক ঘণ্টা থাকবেন—জরুরী ডাক এসেছে তাই। কেবল সিং পরদিনই ফিরবেন। ও'র সঙ্গে আজ দেখা হল না বলে কাল চা খেতে ডেকেছেন এবং তখনি কথাবার্তা হবে বলেছেন। জার্মান ফরেন অফিসের অনেকে রয়েছেন, বেরেনডংক ছাড়া ইনফরমেশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাঃ ওয়াইস Weiss রয়েছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল মিঃ ও মিসেস পাবশ্ ঘরে ঢুকেছেন। পাবশ্-দম্পতি কলকাতায় সুপরিচিত। কলকাতায় জার্মান কনসাল থাকার সময় তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেননি এমন লোক কলকাতার সাহিত্যিক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ সমাজে কমই আছেন। পাবশ্ এখন বন-এ ফরেন অফিসে রয়েছেন। ডাঃ ওয়ার্থের ঠাসা প্রোগ্রামে আগেই দেখেছিলাম বন-এ পাবশ্দের গৃহে আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়েছে কোন এক রাত্রে। এখন সম্মেলনে ও'দের উপস্থিত হতে দেখে বিশেষ আনন্দ হল।

একটু পরে সমবেত অতিথিরা লাউঞ্জ থেকে ব্যাংকোয়েট হল-এ এসে জড়ো হলেন। সেখানে ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা। সকলে সেইভাবেই ছড়িয়ে বসলেন, বেশ হালকা ইনফর্মাল পরিবেশ। হলের এক পাশে ডাঃ ওয়ার্থ, ডাঃ বসু প্রমুখ বক্তারা। আর তাঁদের ঠিক উল্টো দিকে দেয়ালে রয়েছে স্ক্রীন—ফিলম্ ও বক্তৃতার সময় স্লাইড ব্যবহারের জন্য।

আমার এই নূতন ধরনের সম্মেলন বেশ ভাল লাগছিল। সবাই ছোট ছোট দলে টেবিল ঘিরে বসে আছি, যেন পার্টি হচ্ছে। যেন হচ্ছে বলি কেন—সত্যিই একটু পর পর টেবিলে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজবের মধ্যেই সিরিয়াস আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বক্তারা উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক বক্তৃতা শুরু করলেন। হোটেল ড্রেজেনের বিখ্যাত ব্যাংকোয়েট হল এতক্ষণ দেয়াল-জোড়া ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছিল। এবার একে একে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার হলে বক্তৃতার সংগে স্লাইড প্রোজেক্ট করা শুরু হল। ডাঃ ওয়ার্থ জার্মান ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ডাঃ বসুর বক্তৃতার ঠিক আগে নেতাজীর ওপর ফিলমটি প্রদর্শিত হল। য়ুরোপের যেখানে গিয়েছি সেখানেই এই নেতাজী ফিলমটি সকলের চিত্ত জয় করেছে। ওয়ার্থের মত ছিল, আগে ছবিটি দেখে উপস্থিত সকলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খানিক প্রত্যক্ষ ধারণা করে নিক,

'গান্ধী ও লেনিন' বই এর লেখক ভারত বন্ধু রেনে ফুলপ মিলার ও শ্রীমতী ফুলপ মিলারের সংগে সুভাষচন্দ্র (ভিয়েনা ১৯৩৬)

বার্লিনে সোফিয়েন ষ্ট্রাসের বাস ভবনের বাগানে নেতাজী (১৯৪২)

Abschrift.

Albergo Quirinale
Rome
the 5th July, 1941.

Dear Dr. Woermann,

I am glad to have your letter of the 24th June, which reached me on the 28th ultimo and I thank you for the contents thereof.

I met Count Ciano after his return from Venice, as desired by him. The talk was not encouraging for me and soon after that, the war in the East broke out. The prospect for the realisation of my plans looked gloomy in the altered circumstances and I was thinking that my early return to Berlin would not be of much use, till the situation in the East was clarified. I was therefore happy to receive your letter.

I have informed the Foreign Office that I intend to leave soon and I have arranged to start for Vienna on Tuesday the 8th inst. I shall be stopping at Grand Hotel in Vienna for a few days and shall be in Berlin on Monday, the 14th inst. at the latest. If you so desire, I could cut short my stay in Vienna and [illegible] to Berlin. If so, kindly send me a message at the Grand Hotel or to [illegible] [illegible].

The public reaction in my [illegible] situation in the East is unfavourable [illegible] ment. However, I am following [illegible] so I can and I shall [illegible] as soon as I [illegible].

With kind regards,

[illegible] (gez.) O. Mazzotta.

ওয়ার্মান কে লেখা নেতাজীর চিঠি [illegible]

হামবুর্গে নেতাজী (১৯৪২)
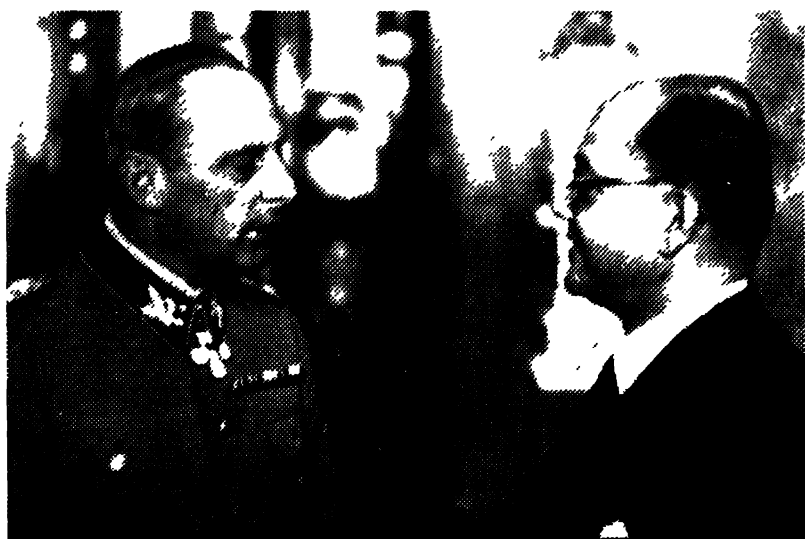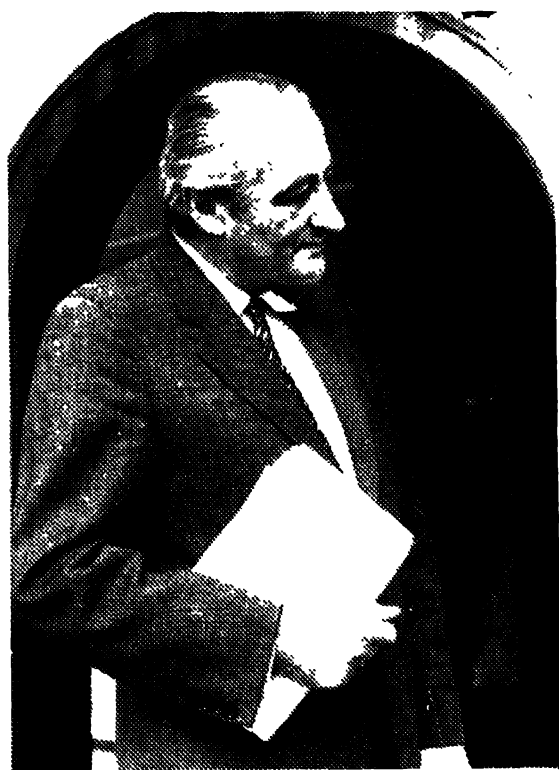
ডাঃ আলেকজান্ডার ওযার্থ (স্পেশ্যাল ইণ্ডিয়া ডিভিশন, বার্লিন)

হামবুর্গের জনসভায় শ্রোতার আসনে নেতাজী

16, Herbert Street,
Cambridge.
22.4.21.

To
The Right Hon. E. S. Montagu M.P.,
Secretary of State for India.

Sir,

I desire to have my name removed from the list of probationers in the Indian Civil Service.

I may state in this connection that I was selected as a result of an Open Competitive examination held in August, 1920.

I have received an allowance of £100/- (one hundred pounds only) up till now. I shall remit the amount to the India Office as soon as my resignation is accepted.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Subhas Chandra Bose.

সুভাষচন্দ্র ICS থেকে পদত্যাগ করে চিঠি লিখছেন সেক্রেটারি অফ্ স্টেট মন্টেগুকে।

11th December 1940.

1941

Dear Linlithgow,

I enclose a copy of a letter addressed by Subhas Bose to the Chief Minister on the 9th December last after his release. This letter was discussed in Cabinet this morning, and it was agreed that the Home Minister should state in reply that Government did not intend to withdraw either the order under section 26 of the Defence of India Rules, or the two cases at present pending. The Home Department have obtained legal opinion to the effect that there is no essential anomaly arising from the fact that Subhas is neither in custody nor on bail. It was agreed in Cabinet that as soon as he recovers his health, he should be rearrested, and that his trial should continue. If he resorts to hunger strike again, the present 'cat and mouse' policy will likewise be continued, and it is expected that its employment will serve both to render him innocuous and to make him realise that nothing is to be gained from a series of fasts.

I shall, of course, discuss the position further with you when you arrive in Calcutta, and for the moment I merely wish to keep you informed of the position, and to make it clear that it was never my intention to disregard the understanding arrived at last July. No order for the permanent release of Subhas Bose has yet been issued. All that has been done is to suspend temporarily the order for his detention.

Yours sincerely,

Sd/- J.A. Herbert.

His Excellency the Viceroy
& Governor-General of India.

ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে গভর্নর হার্বার্ট চিঠি লিখছেন "ক্যাট অ্যান্ড মাউস" পলিসি ব্যাখ্যা করে।

তারপর ডাঃ বসুর বক্তৃতা বুঝতে ও আলোচনায় অংশ নিতে ওদের সুবিধা হবে। তাই প্রাগ-এর কনফারেনসের মত সবশেষে ফিলম্ না করে আলোচনার মধ্যপথে ফিলম্ প্রদর্শিত হল। ওয়ার্থের আইডিয়া বোধহয় ভালই ছিল। ডাঃ বসুর বক্তৃতার সময় সকলে যেন একটি নূতন আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। হয়ে যাবার পর বেরেনডংক ও ফরেন অফিসের অন্যান্যরা উঠে এসে করমর্দন করলেন।

এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে বেরেনডংক বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন মনে হল। পরদিন আমাদের রাষ্ট্রদূত কেবল সিং-এর সংগে দেখা হতে উনিও সেই কথা বললেন—'গতকাল সম্মেলন খুব ভাল ভাবে হয়ে গেছে আমি খবর পেয়েছি, আমার এমব্যাসির অফিসাররা তো বলেছেনই, তাছাড়া বেরেনডংক নিজে আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন, উনি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছেন।' সেদিন সন্ধ্যায় বেরেনডংক এবং ফরেন অফিসের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বললেন—'পলিটিক্যাল আর্কাইভস্-এর কাগজপত্রের ব্যাপারে আমরা তো পূর্ণ সহযোগিতা করবই, দেখুন যদি ফিলম্ মেটিরিয়াল আরো থাকে। নেতাজীর এই ছবিতে জার্মান সাইডটা আরো বড় হতে পারে, বেশীর ভাগ ডকুমেণ্টারি হল ইস্ট এশিয়ার। তথ্যচিত্রটি আরো বড় করুন—খুব ইম্প্রেসিভ্ ছবি।'

রাত বারোটায় সভা ভংগ হলে সকলে একে একে বিদায় নিলেন। লক্ষ্য করলাম হোটেল ড্রেজেনের কর্মচারীরা এক কোণে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সভার কাজকর্ম দেখেছে।

পরদিনও সকাল থেকেই নানান কাজ। ডাঃ ওয়ার্থের প্রোগ্রামে বিশ্রামের অবকাশ নেই। সকাল সকাল ডাইনিং হল্-এ নেমে এসে জানলার ধারে বসে রাইন নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম। চিফ্ ওয়েটার মনে হল যেন আমাদের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। টেবিল-ক্লথটা পরিষ্কারই ছিল, তবু আর একটা তার ওপর পেতে দিলে, ফুলদানিটা বদলে তাড়াতাড়ি আর একটা আরো ভাল এনে বসিয়ে দিলে। ভাবছি ব্যাপার কি! তারপর আমি যখন পট্ থেকে কফি ঢালছি তখন আস্তে আস্তে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'উড্ ইট্ বি টু মাচ্—যদি আমি একটা অনুরোধ করি?' আমরা চেয়ে দেখি ওর হাতে নেতাজীর জার্মান জীবনী Der Tiger Indiens— ডাঃ ওয়ার্থ এই জীবনীর সম্পাদনা করেছেন। বইটি খুলে ডাঃ বসুর দিকে ধরলে—একটি নাম সই চাই। সে বললে, যুদ্ধের সময় আমি চন্দ্র বোস্'কে দেখেছি, যদিও আমার বয়স তখন অল্প ছিল।

বন-এর ইনস্টিটিউট ফর ফরেন পলিটিকস্-এ যাওয়া হল একদিন। সেখানকার প্রবীণ ডিরেক্টর নেতাজীকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন বললেন। পলিটিক্যাল ডিভি-সনের ডাঃ মেলচার্স নেতাজীর সংগে ওর পরিচয় করিয়ে দেন। নেতাজী সম্বন্ধে আরো ফিলম্ পাওয়া সম্ভব কি না তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। উনি বললেন, ফিলম্ পাওয়া খুবই কঠিন হবে মনে হয়। কোবলেনজ শহরের কাছে উফা বলে জার্মান যে ফিলম্ সংস্থা আছে, তাদের বিরাট ফিলম্ সংগ্রহালয় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় সব ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটা ঠিক। কারণ যা কিছু জার্মান ডকুমেণ্টারি পাওয়া গেছে তা এই উফার সূত্রেই পাওয়া।

সারাদিন নানা কাজের মধ্যে এক ফাঁকে বিঠোফেন হাউসে ঘুরিয়ে ছিলেন ওয়ার্থ। বাড়ির পিছন দিকে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ছোট একখানা ঘর, বিঠোফেন এ ঘরে জন্মেছিলেন। সামনের দিকে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ঘরগুলি জুড়ে মিউজিয়াম। প্রথম কয়েকটি ঘরে সেকালের বন শহরের ছবি, বিঠোফেনের ছেলে-বেলার ও পরিবার-পরিজনের ছবি। পরের ঘরগুলির নাম অর্গ্যান রুম, ম্যানাসক্রিপ্ট

রুম, ভিয়েনিজ রুম ইত্যাদি। ভিয়েনিজ কক্ষটিতে রয়েছে বিঠোফেনের শেষ ব্যবহৃত পিয়ানো।

সেদিন কেবল সিং-এর সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা ও পাবশ্দের সঙ্গে ডিনার, এই করতে করতে রাত বারোটা হল। রাষ্ট্রদূত হিসেবে কেবল সিংকে বেশ ভালই লাগল। ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির, আমার মনে হচ্ছিল একটু যেন বিষণ্ণ। তখন জানতাম না, পরে শুনলাম মাত্র অল্পদিন আগে সন্তানের মৃত্যুশোক গেছে এঁদের ওপর দিয়ে। সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য কেবল সিং দুঃখ প্রকাশ করলেন। মাত্র দু' ঘণ্টা হল ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফিরেছেন। উনি বললেন, জার্মানীতে নেতাজীর কর্মজীবনের যা কিছু বিবরণ ও তথ্য পাওয়া যাবে তা সংগ্রহ করা জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। আমার সব কনসালদের নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি, যেখানে নেতাজী সম্বন্ধে যা কিছু কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। পূর্ব বার্লিনে তো আজমানী রয়েছেনই, পশ্চিম বার্লিনে আছে জহরী, সেও খুব কর্মদক্ষ। হামবুর্গের মহীন্দর সিং আছে, তাকে খবর দিয়ে রাখছি, তোমরা হামবুর্গে তার সঙ্গে যোগাযোগ করো।

পাবশ্দের সঙ্গে একটা সন্ধ্যা চমৎকার কাটল। ও'রা কলকাতা-প্রেমিক, কলকাতা ও'দের মন হরণ করেছে। পারলে আবার ফিরে যেতে চান। বিদেশীর এই কলকাতা-প্রীতি দেখলে আমাদের ভাল লাগে। কলকাতাকে ভালবাসা মানে বাঙালী সংস্কৃতিকে ভালবাসা। পূর্ব বাংলার বাঙালীদের জন্যও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন ও'রা। পাবশ্দের বাচ্চা মেয়েরা স্লিপিং স্যুট পরে বিছানা থেকে বেরিয়ে এল। কিছুতে আর ঘুমোতে যাবে না—বেজায় উত্তেজিত। ক্যালকাটা থেকে লোক এসেছে যে!

॥ তেরো ॥

বন-বাডগোডেসবার্গ ছেড়ে আসার আগে ওয়ার্থের বাড়ির ছাদে বসে আর একদিন দীর্ঘ সময় কথাবার্তা হল। সেদিন সকালে ফরেন অফিসের পলিটিক্যাল আর্কাইভস্-এ কাগজপত্র দেখে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলাম। যুদ্ধের সময়, বিশেষত যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর ইংরেজ, আমেরিকান ও রাশিয়ান কত হাতে এদের সব দলিলপত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। ধীরে ধীরে আবার সব যোগাড় করে গুছিয়ে আনা হয়েছে। এখান থেকে প্রথম দফায় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে যখন সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠানো হয় তখনো সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ উলরিশ আর্কাইভস্-এ ছিলেন। যা কিছু প্রয়োজন সব উনি নিজে গুছিয়ে পাঠান। এর কিছুকাল পরে উলরিশ ক্যানসার হয়ে মারা যান। প্রায় দশ বছর সাইবেরিয়াতে বন্দীজীবন কাটাবার পর ওঁর স্বাস্থ্য এমনিতেই একেবারে ভেঙে গিয়েছিল।

যে কোন আর্কাইভস্-এর কাগজপত্র দেখতে হলে দীর্ঘ সময় দরকার। বন-এ আমাদের হাতে সে সময় কই? অথচ মনে হয় এখানকার প্রতিটি টুকরো কাগজও প্রয়োজনীয় হওয়া সম্ভব। লোথার ফ্রাংক এখানে অনেকদিন কাগজপত্র দেখেছেন, সকলের কাছে সুপরিচিত। ওয়ার্থ আশ্বাস দিলেন ফ্রাংকের সহায়তায় উনি আমাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবেন।

সেদিন ওয়ার্থের বাড়ির ছাদে চড়া রোদ্দুর, এরা বলে 'বিউটিফুল সান্।' আমি তো চেয়ারটা ছায়াতে সরিয়ে নিয়ে বসলাম। পরিচারিকা এসে জাগ্ ভর্তি ঠাণ্ডা ফলের রস রেখে গেল। ওয়ার্থের হাতে অবশ্য অবধারিত শ্যাম্পেনের গেলাস।

আমি প্রশ্ন করছিলাম—আচ্ছা, নেতাজী যুদ্ধের সময় বার্লিন ওঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন—ওঁর এই বেছে নেওয়াটা কি ভুল হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাবে ওয়ার্থ বললেন, না, ইতিহাসের ঘটনাচক্র তখন যা ছিল তাতে বার্লিনে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিকই করেছিলেন। আর কোথায় যেতে পারতেন? হ্যাঁ, রোমে যাওয়া যেত। মুসোলিনির প্রতি এবং সাধারণভাবে ইটালিয়ানদের প্রতি ওঁর একটা দরদ ছিল। মস্কো যেতেও নেতাজী বিন্দুমাত্র আপত্তি করতেন না। বস্তুত খুশিই হতেন। কাবুল থেকে উনি তো মস্কো হয়ে এলেন, যদি সেখানে একটুও সাড়া পেতেন তবে হয়ত মস্কোই ওঁর কর্মক্ষেত্র হতো। কিন্তু তা তো সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রবল আঘাত হানতে হবে এই ছিল নেতাজীর উদ্দেশ্য। জার্মানরাই তখন ইংরেজদের প্রবল প্রতিপক্ষ। যদি কেউ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে পারে তো জার্মানরাই পারবে—অন্তত তখন সেইরকমই মনে হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় নেতাজী স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যারা শত্রু তারা ভারতবর্ষের বন্ধু —"natural allies of India."

তবে বার্লিনে নেতাজী কতদিন থাকতে পারতেন ওয়ার্থের সন্দেহ আছে। শুধু যদি পার্টির লোকদের সঙ্গে ওঁকে কাজ করতে হতো উনি হাঁপিয়ে যেতেন। যে সব লোকের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেরই নেতাজীর মত লোকের কদর বুঝতে পারার মত শিক্ষা-দীক্ষা, দূরদৃষ্টি কিছুই ছিল না। অ্যাডাম ফন ট্রট ও নেতাজীর যোগাযোগ সেদিক দিয়ে একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনা। ট্রট নেতাজীর মূল্য বুঝেছিলেন, আবার নেতাজীর চিন্তাধারা কাজে পরিণত করার জন্য যে ক্ষমতা ও প্রভাব দরকার তাও সে সময়ে ট্রটের ছিল। বিভিন্ন কারণে নেতাজী পূর্ব এশিয়া চলে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওয়ার্থ বললেন—তবুও দু' বছর আমরা নেতাজীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বেঁধে গেল ১৯৪১-এর জুন-এ। এই ঘটনায় নেতাজী বিব্রত ও বিচলিত বোধ করেছিলেন। কারণ উনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন এ যুদ্ধ যেন না-হয়। এ যুদ্ধ হলে ওঁর নিজের কাজের পরিকল্পনা গুরুতররূপে ব্যাহত হবে। তা ছাড়া জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে এর প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে মোটেই ভাল হবে না এ কথা উনি জানতেন। রোম থেকে জার্মান ফরেন অফিসের ওয়ারম্যানকে লেখা একটি চিঠিতে ওঁর মনের বিরক্তি ও হতাশার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই চিঠিতে নেতাজী নাম সই করেছেন 'অরল্যান্ডো মাৎসোটা।' রোম থেকে ফিরে এসে নেতাজী ওয়ারম্যান-এর সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে রুশ-জার্মান যুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার এক রিপোর্ট ওয়ারম্যান ফরেন অফিসে পেশ করেছিলেন। নেতাজী ওঁকে পরিষ্কার বলেছেন, রুশ-জার্মান যুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণ জার্মানীকে আক্রমণকারী রূপে চিহ্নিত করেছে। ফলে ব্রিটিশরা একথা বলার সুযোগ পাবে যে জার্মানরা ভারতের মুক্তি চায় না, ইংরেজকে তাড়িয়ে নিজেরা প্রভুত্ব করতে চায়। নেতাজী বলছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে জার্মান গভর্নমেণ্ট যদি একটি সরকারী ঘোষণা এখনি না করেন তবে বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার গঠন করা বৃথাই হবে।

এরপর নেতাজী পূর্ব এশিয়া যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। '৪২ সালের জানুয়ারীতেই নাম্বিয়ারকে বলেছিলেন যে, জার্মানীতে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ছে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর নেতাজী নিঃসন্দেহ হলেন যে তাঁর পূর্ব এশিয়া যাওয়া নিতান্ত জরুরী, সেখানেই উনি কাজের সুযোগ বেশী পাবেন। বার্লিন ও রোমে

জাপানী দূতাবাসের মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ স্থাপিত হল। জার্মান আর্কাইভস্‌এর দলিলপত্রে দেখতে পাই, প্রবীণ নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বার্তা-বিনিময়, টেলিফোনে আলাপ ইত্যাদি চলছে। এই সময়ে বার্লিনে জাপানী রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওসীমা। তিনি নেতাজীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সে আমলে ডিপ্লোম্যাট মহলে ওসীমার নাম-ডাক ছিল। শোনা যায় ওসীমা বলেছিলেন যে, তাঁর সুদীর্ঘ ডিপ্লোম্যাট জীবনে উনি নানারকম লোক দেখেছেন কিন্তু নেতাজীর মত আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর একটি দেখেননি। জাপান থেকে সরকারীভাবে নেতাজীর কাছে নিমন্ত্রণ এসে পেঁছল।

কিন্তু প্রশ্ন হল উনি যাবেন কি করে? এই ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে জার্মানী থেকে জাপান যাওয়া তো সহজ কথা নয়। একবার কথা হল ইটালিয়ান এরোপ্লেনে রোম থেকে সিঙ্গাপুর বা বার্মা উপকূল নন-স্টপ ফ্লাইটে যাবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব পরে বাতিল হল। নেতাজী সাধারণ জাহাজে চড়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে মনে হল। নেতাজীর জীবন নিয়ে এত বড় ঝুঁকি জার্মান গভর্নমেন্ট নিতে সাহস করলেন না। শেষ পর্যন্ত সাবমেরিনে যাওয়া স্থির হল।

শেষের দিকে সব কিছু ঠিক হয়ে-হয়েও হতে চায় না। নেতাজী অত্যন্ত ছটফট করছিলেন। ভারত মহাসাগরে জার্মান সাবমেরিন থেকে জাপানী সাবমেরিনে উঠতে হবে। দুদিক থেকে রওনা হবার সময়, মাঝ-সমুদ্রে দুই সাবমেরিনে মিলন—সব প্ল্যান নিখুঁত হলে তবেই নেতাজীকে, আজকাল যাকে আমরা গ্রীন সিগন্যাল বলি, তা দেওয়া সম্ভব হবে। বাধার আর শেষ নেই। টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূত টেলিগ্রাম করলেন, এরা বলছে মিলিটারি লোক না হলে জাপানী যুদ্ধের জাহাজে নিতে আইনগত বাধা আছে। ট্রট অধৈর্য হয়ে ফিরে টেলিগ্রাম করলেন, নেতাজী তো সিভি-লিয়ান বা অসামরিক লোক নন, উনি ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক।

তারপরেও দীর্ঘ প্রতীক্ষা। জাপানী সাবমেরিনের গতিবিধির খবর আর এসে পেঁছয় না। এদিকে জার্মান সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন অধৈর্য হয়ে পড়ছে, দেশের এই যুদ্ধাবস্থার মধ্যে কতদিন সব কাজ ফেলে অপেক্ষা করতে হবে! এর পরের কাহিনী ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ার দুজনের কাছেই শুনেছি। প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ারের কাছে একই ঘটনার অনেক কথা শুনেছি, কারণ ওরা দুজনে সর্বদাই নেতাজীর সঙ্গে থাকতেন। এমন কি বাইরে গেলেও প্রাগ, রোম, প্যারিস—নেতাজীর সঙ্গে দুজনেই যেতেন।

জাপানী সাবমেরিনের খবর না পেয়ে নেতাজী একেবারে ভেঙে পড়লেন। ওঁকে এত মনমরা হতে কখনো ওঁরা দেখেননি। বারবার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে জাপানী দূতাবাসে। ওসীমা কেবলই বলেন—খবর আসবে, নিশ্চয় আসবে। এমনি সময় একদিন জাপানী দূতাবাসের কাউন্সিলর কাওয়াহারা নেতাজী, ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ারকে তাঁর সুন্দর ভিলায় লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছেন। টেবিলে বসে নেতাজী শুধু খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। মুখ দেখে বোঝা যায় কোন কিছুতে ওঁর রুচি নেই। কথাবার্তাও ভাল করে বলছেন না। কাওয়াহারা খানিকক্ষণ নেতাজীর অবস্থা দেখলেন, তারপর বললেন—'আজ আমি আমার জীবনে প্রথম ডিপ্লোম্যাটিক প্রথা ভঙ্গ করব। আপনাকে আমার বলার কথা নয়—আমাদের দূতাবাসের নেভাল (naval) অ্যাটাচে সরকারীভাবে আপনার মিশনকে জানাবে, এই রকম কথা হয়েছে আর তাই রীতি—কিন্তু আমি আপনার অবস্থা আর দেখতে পারছি না। আপনাকে আমি বলছি, জাপানী সাবমেরিনের খবর এসে গিয়েছে,

সব ঠিক আছে।' এক মুহূর্তে নেতাজীর চোখমুখের চেহারাই পালটে গেল।

ঠিক বার্লিন ছেড়ে যাবার আগে দুটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে নেতাজী যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য ২৩শে জানুয়ারী জন্মদিনের উৎসব যদি ধার তবে বলা যায় নেতাজীকে ঘিরে তিনটি অনুষ্ঠান পর পর হয়েছিল। '৪৩-এর ২৬শে জানুয়ারী খুব ধুমধাম করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল। বার্লিনের এয়ারফোর্স হাউসে এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় নেতাজী জার্মান ভাষায় অপূর্ব বক্তৃতা করেছিলেন। আর ২৮শে জানুয়ারী কয়নিগসব্রুকে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

এয়ার ফোর্স হাউস-এ Haus der Flieger) আয়োজিত ২৬শে জানুয়ারীর সভায় নেতাজী এক সময় বলেন যে আমাদের ভারতীয়দের কাছে জীবন হল ঈশ্বরের লীলা। "It is Leela—an eternal play of forces", এই লীলায় শুধু যে সূর্যের আলোক আছে তাই নয়, অন্ধকারও আছে, শুধু যে আনন্দ আছে তাই নয়, বেদনাও রয়েছে, উত্থান যেমন আছে তেমনি আছে পতন। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের ওপর বিশ্বাস না হারাই তবে এই অন্ধকার বেদনা ও অপমানের পথ পার হয়ে সূর্যালোক আনন্দ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারব।

কেন এই দার্শনিক তত্ত্বকথার অবতারণা তা বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে ভারত-আত্মাকে চিনতে হবে। ব্রিটিশরা বুঝতে পারেনি কিন্তু জার্মানরা পারবে। কারণ জার্মানী হল কানট, হেগেল, গ্যেটে, শ্যোপেন-হাওয়াব, ম্যাক্স-মুলরের দেশ।

অবশ্য রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়েও অনেক বলেছেন। ১৮৫৭ সাল থেকে শুরু করেছেন। উনি বলেন, যদিও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, ওটা "সিপাহী বিদ্রোহ", আমি কিন্তু এই বিপ্লবকে ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ মনে করি।

এই বক্তৃতায় নেতাজী গান্ধীজীর নেতৃত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। উনি বলছেন, মহাত্মাজী আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে একটা নিরস্ত্র জাতি পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের সাহায্যে বিদেশী শাসনযন্ত্রকে সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া যায় মাত্র, নির্মূল করা যায় না। তার জন্য চাই সশস্ত্র সংগ্রাম।

চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে নেতাজীর কোন সংশয় নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক সঙ্গে থাকতে পারে না। "The one must die if the other has to live. And since Indian nationalism must live—British Imperialism must die."

কয়নিগসব্রুক-এর শিবিরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার আজাদ হিন্দ সৈনিকের সমাবেশে ২৮শে জানুয়ারী নেতাজী বক্তৃতা করলেন। সৈনিকেরা জানত না নেতাজী তাদের ছেড়ে শীঘ্রই এক বিপদের পথে রওনা হবেন। কিন্তু নেতাজী জানতেন এদের কাছে এই তাঁর শেষ বক্তৃতা। যে পথে উনি যাবেন তাতে জীবন থাকতে পূর্ব এশিয়া পৌঁছতে পারবেন কিনা গভীর সন্দেহ। আসন্ন বিচ্ছেদ ও সম্ভাব্য মৃত্যুর পটভূমিকায় নেতাজী এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। প্রচণ্ড শীতে খোলা মাঠে সমাবেশ হয়েছিল। নেতাজীর শরীরটাও ভাল ছিল না, কথা ছিল পনেরো-কুড়ি মিনিট বলবেন। কিন্তু বলতে শুরু করে দু' ঘণ্টার ওপর বললেন, অভিবাদন গ্রহণ করলেন, ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের হাতে তুলে দিলেন ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পতাকা।

আমাদের পরম ভাগ্য যে ২৬শে ও ২৮শের এই দুটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানেরই অংশবিশেষ ডকুমেণ্টারি চিত্রে রয়ে গেছে।

সাবমেরিন যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত। একজন মাত্র সঙ্গী নেওয়া চলবে, কে যাবে? নেতাজী বেছে নিলেন আবিদ হাসানকে। নাম্বিয়ারের ওপর রইল বার্লিনের ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের দায়িত্ব।

একদিন 'অরল্যাণ্ডো মাৎসোটা পরিকল্পনা' করতে হয়েছিল ফন ট্রট ও ওয়ার্থকে। আজ আবার টপ সিক্রেট প্ল্যান হল। ওয়ার্থ, স্টেট সেক্রেটারি উইলহেলম্ কেপলার, নাম্বিয়ার ও নেতাজী বার্লিন থেকে কীল বন্দরে যাবেন। সঙ্গে চলেছেন আবিদ হাসান। সিকিওরিটির কড়াকড়ির জন্য হাসানকে পর্যন্ত বলা হয়নি কোথায় যাওয়া হচ্ছে। হাসান সারা পথ ট্রেনে গ্রীক গ্রামার মুখস্ত করতে করতে চলেছেন—ওঁর ধারণা কীল থেকে ওঁরা গ্রীসে যাবেন। এক সময়ে ট্রেনে আবিদ হাসান নাম্বিয়ারকে বললেন—গ্রীক ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নিই, কি বলো? নাম্বিয়ার হেসে বললেন, তা গ্রীক ভাষা একটু জানা থাকা মন্দ কি?

একদিন অরল্যাণ্ডো মাৎসোটাকে বার্লিনে অভ্যর্থনা করেছিলেন ওয়ার্থ, আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কীল থেকে সাবমেরিনে তুলে দিলেন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩-এ।

ওয়ার্থ বলছিলেন, যত দিন যাবে নেতাজীর ওপর রিসার্চ তত দুরূহ হয়ে উঠবে, কারণ প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। জার্মান দিকটার কথাই ভাবা যাক। যারা বিশেষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আজ তাঁদের মধ্যে ক'জন আছেন? হিটলার নেই, রিবেনট্রপ নেই, অ্যাডাম ফন ট্রট তো আগেই গেছেন, উইলহেলম্ কেপলার মারা গেছেন, উর্লারিশও অল্পদিন আগে মারা গেছেন। ওয়ার্থ নিজের কথা বলছেন—আমারও বয়স হয়ে গেছে, মানুষ তো আর অমর নয়, যথা-সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ করে নিতে হবে।

এইসব কথা ভেবেই কিছুকাল আগে Der Tiger Indiens নামে নেতাজীর জীবনী সম্পাদনা করেছেন ওয়ার্থ। বেশ অভিনব জীবনী—জাপানী, জার্মান ও ইংরেজী এই তিন ভাষায় বইটি পরিকল্পিত এবং ভিন্ন ভিন্ন লেখকেরা নেতাজীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের ওপর লিখেছেন।

বন এয়ারপোর্টে আমাদের তুলে দিতে চলেছেন ওয়ার্থ। পথে বললেন, খবর শুনেছ তো? কোয়ারনি মারা গেছেন রোমে। নেতাজী যখন কাবুলে, কোয়ারনি তখন সেখানকার ইটালিয়ান দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত। কোয়ারনি আসবেন 'নেতাজী অরেশন' দিতে কলকাতায় সব ব্যবস্থা ঠিক ছিল। ওঁর মৃত্যুতে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। ওয়ার্থ বললেন—এই জন্যেই বলছিলাম নেতাজীর আদর্শ আমাদের উত্তরপুরুষের জন্য লিপিবন্ধ করে যেতে হবে।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আচ্ছা অ্যালেকজাণ্ডার ওয়ার্থের কি স্বার্থ! নেতাজীর ভাবাদর্শ পৃথিবীর মানুষ মনে রাখল কি ভুলে গেল, তার জন্য এই জার্মান এত ব্যস্ত কেন? যেন আমার মনের কথা ধরতে পেরেই ওয়ার্থ বললেন—যে একবার নেতাজীর সংস্পর্শে এসেছে, তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছে, তার সাধ্য কি নেতাজীর প্রভাবমুক্ত থাকবে? সে জীবনে কোনদিন তাঁকে ভুলতে পারবে না। ডাঃ ওয়ার্থ গভীর ভাবাবেগের সঙ্গেই বললেন—এরকম একজন দুর্লভ ব্যক্তিকে জানতে পেরেছিলাম, তার সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম—আমার জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য বলে গণ্য করি।

॥ চৌদ্দ ॥

হামবুর্গে আমাদের জন্য নানারকম অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছিল। একদিন হামবুর্গার স্ট্রাসেতে পথ হারিয়ে ফেললাম, আর একদিন হারালাম ক্যামেরা। হামবুর্গের মত একটি প্রকান্ড জার্মান শহরে বসেও খেলাম আরব লাঞ্চ, চাইনিজ ডিনার, নাটক দেখলাম ব্রিটিশ—বার্নার্ড শ'র 'আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান'। আর বাস করলাম একটি নরওয়েজিয়ান ক্লাবে—ডেন নরস্কে ক্লুব (Den Norske klub) যেখানে আমাদের ঘরের নামও নরওয়ের একটি শহরের নামে ট্রনডহাইম (Trondheim) আর হামবুর্গে যে নেতাজী-সভার আয়োজন হয়েছিল সেটি অনুষ্ঠিত হল ওখানকার আমেরিকা হাউসে।

হামবুর্গে অবস্থিত নর্থ জার্মান টেলিভিশন কেন্দ্র (N. D. R.) অল্পদিন হলো নেতাজীর ওপর একটি সুদীর্ঘ ডকুমেন্টারি চিত্র জার্মান টেলিভিশনে দেখিয়েছেন। যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ছবিটি তৈরী করা হয়েছে। এর জন্য একটি টেলিভিশন টীম য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ইন্টারভিউ করে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে আনে। এই তথ্য সংগ্রহের সূত্রে কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে এদের যোগাযোগ। হামবুর্গে আসার একটি উদ্দেশ্য ছিল এই টেলিভিশন কর্মীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন। দেখে আনন্দ হল এই পুরোপুরি জার্মান টেলিভিশন টীমের একমাত্র ভারতীয় সদস্য হলেন টীমের পরিচালিকা শ্রীমতী নবীনা সুন্দরম্। ইনি বয়সেও নিতান্ত নবীনা। কিন্তু এ'র দক্ষ পরিচালনায় জার্মান টি ভি ডকুমেন্টারিটি একটি তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র হয়ে উঠেছে।

হামবুর্গে পেঁছেই আমরা কাজে লেগে গেলাম বলা চলে। এয়ারপোর্টে পা দেবার ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা রাটহাউস অর্থাৎ পৌরসভার আর্কাইভস্-এ উপস্থিত। এয়ারপোর্টে মিস্ সুন্দরম ও হামবুর্গের ভারতীয় কলা কেন্দ্রের শাহ্ নওয়াজ শেখ্ উপস্থিত ছিলেন। শেখের হাতে গোলাপ ফুলের গুচ্ছ। হামবুর্গের নেতাজী সভার আয়োজনে টেলিভিশনের শ্রীমতী সুন্দরম্ ছাড়াও হামবুর্গের প্রবাসী ভারতীয়দের একটি গোষ্ঠী ভারতীয় কলাকেন্দ্র বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেখলাম অনেকদিন জার্মানীতে কাটিয়ে জার্মান রীতিনীতি এ'রা বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন। নামতে-নামতেই যে প্রোগ্রাম হাতে ধরিয়ে দিলেন তাতে মিনিট-টু-মিনিট যা কিছু করণীয় লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। আমাদের অ্যারাইভাল থেকে ডিপার্চার, রাটহাউসে দলিলপত্র দেখা, হামবুর্গের ইনস্টিটিউট ফর ফরেন পলিটিকস্-এ কাগজপত্র দেখতে যাওয়া, হামবুর্গ শহর ঘুরিয়ে দেখানো—সব কিছু পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। যেমন হামবুর্গের খবর কাগজ আপিস ঘুরিয়ে দেখানোর ভার নিয়েছেন ব্লনড্ চুল এক সুন্দরী জার্মান তরুণী—শ্রীমতী উটে বাওয়েন। শহর ঘুরিয়ে দেখানো ও একটি ঘরোয়া ডিনার-বৈঠকের ভার নিয়েছেন মিঃ দীপংকর সিংহ রায়।

রাটহাউসে আমাদের সঙ্গী হলেন শেখ। দলিলপত্র দেখছি—দরকারী কাগজপত্র বাছাই করে দিচ্ছি, ঘরের একপাশে Xerox কপি করার যন্ত্র রয়েছে। শেখ হিসেব করে করে যন্ত্রের মধ্যে খুচরো ফেলছে আর কাগজ কপি করে নিচ্ছে।

খুচরো ফুরিয়ে যাচ্ছে, বাইরে গিয়ে মার্ক ভাঙিয়ে নিয়ে এসে আবার কাজে লেগে যাচ্ছে।

নেতাজী হামবুর্গ এসেছিলেন সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ। হামবুর্গে জার্মান-ভারত অ্যাসোসিয়েশন Deutsche-Indische Gesellschaft প্রতিষ্ঠিত হলে তারই উদ্বোধন করতে নেতাজী হামবুর্গ এলেন। খুব ধুমধাম করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। হামবুর্গ শহরে নেতাজীকে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে যে সাদর ও সসম্মান অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ ভিয়েনায় বসে শর্মার কাছে শুনে এসেছিলাম। প্রশস্ত রাজপথে নেতাজীকে নিয়ে মোটরকেড চলেছে, পথের দু'ধারে দুই রাষ্ট্রের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে।

উদ্বোধনী সভায় হামবুর্গের গভর্নর বক্তৃতা করলেন, তারপর হামবুর্গের মেয়র ক্রগমান। ভারতের জাতীয় সংগীত জনগণমন অপূর্ব অর্কেস্ট্রেশন হয়েছিল। রাটহাউসের কাগজপত্রে দেখলাম অর্কেস্ট্রেশনের বিলটা রয়েছে, বিল হয়েছিল সাড়ে সাতশ' রাইখ্‌মার্ক।

নেতাজী এই সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই সুদীর্ঘ ভাষণে ইন্দো-জার্মান সম্পর্ক বেশ একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। উনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সংকটজনক মুহূর্তে দেশ যখন আভ্যন্তরীণ গোলযোগে বিপর্যস্ত, তখন য়ুরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। জার্মানী কিন্তু বরাবরই এই ধরনের হীন প্রচেষ্টা থেকে দূরে ছিল। জার্মানীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে উৎসাহ ও আগ্রহ তা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য অনেক জার্মান জ্ঞানীগুণীকে আকৃষ্ট করেছিল। এই প্রসঙ্গে উনি গ্যেটে, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতির নাম করেছেন। জার্মান-ভারত সম্পর্ক তাই সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তিতে স্থাপিত হয়ে গেল। গ্যেটে শকুন্তলা সম্পর্কে কি বলেছেন, তার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করেছেন নেতাজী। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করে নেতাজী বলেছেন, পরবর্তীকালে যখন আমাদের কবি জার্মানীতে এলেন, তখন দুই দেশের এই সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়তর হল।

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে হামবুর্গ শহরের বিশেষ অবদানের কথাও উনি উল্লেখ করলেন। এক, চিকিৎসা শাস্ত্রে, আর এক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। জার্মান-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও হামবুর্গ অগ্রণী হয়েছিল।

হামবুর্গে আমাদের কনসাল জেনারেল মহীন্দর সিং বলছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে আজও হামবুর্গ শহরে এক বিরাট সংখ্যক ভারতীয় বসবাস করছেন। রাটহাউসের কাজের শেষে প্রথমদিনই আমরা মহীন্দর সিং-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। হামবুর্গের নেতাজী-সভার পৌরোহিত্য করবেন মহীন্দর সিং, সেই উপলক্ষে কাজের কথাবার্তা কিছু হল। সভাপতির ভাষণে কি ধরনের কথা উনি বলবেন বা বললে ভাল হয় এ সম্বন্ধে উনি একটু আলোচনা করে নিলেন।

রাটহাউসের দলিলে প্রধানত রয়েছে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণ, বক্তৃতা ইত্যাদি, এ ছাড়া জার্মান-ভারত অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলী, অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন রিপোর্ট, মেয়র ক্রগমানের সঙ্গে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের মিঃ ভট্টর চিঠিপত্র। কিন্তু ইনস্টিটিউট ফর ফরেন পলিটিকসের কাগজপত্র ছিল আরো বিচিত্র ধরনের।

ডেন নরস্কে ক্লুবের বাসস্থানটি আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল। আমাদের দরকারী জায়গাগুলো মোটের উপর হাতের কাছেই। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আমেরিকা হাউস, মিনিট সাতেক হাঁটলেই আউসভারটিগে পলিটিকের বাড়ি। এবার য়ুরোপে

সর্বত্র গ্রীষ্ম যাই-যাই করেও যেতে চাইছিল না। হামবুর্গ এসেই প্রথম টের পেলাম বাতাসে শীতের ছোঁয়া। য়ুরোপে শরৎকাল বা 'ফল' এসে গিয়েছে। হাইমহুডার স্ট্রাসে যে রাস্তায় আমরা ছিলাম তার দু' পাশের গাছের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। টার্নিং অফ্ দি লিভস্ দেখতে শহর থেকে দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, রাস্তার দু' ধারে ঘনছায়া গাছের পাতায় হলুদ বিবর্ণ ছোপ। হামবুর্গ শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে হয়েও হাইমহুডার স্ট্রাসে রাস্তাটার কেমন একটা নির্জন, মায়াময় সৌন্দর্য ছিল। ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম একটা রঙীন ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখতে হবে। প্রথম দিকে কাজের চাপে আর শেষের দিকে ক্যামেরা হারানোর বিভ্রাটে ছবি তোলা আর হয়ে ওঠেনি।

একদিন সকালে কাজে বেরিয়ে ট্যাক্সির পিছনে ক্যামেরা ফেলে ভুলে নেমে পড়েছিলাম। আমরা কলকাতার লোক, ফেরৎ পাবার আশা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলাম। কিন্তু হামবুর্গের বন্ধুরা খুব নিশ্চিন্তভাবে বলতে লাগলেন, ও ঠিক পাওয়া যাবে। কিন্তু চেষ্টা করেও, কিছুতে ওয়ারলেস সংযোগ করা গেল না ট্যাক্সির সঙ্গে। জার্মানীতে ট্যাক্সিতে ভাড়া দিলে রসিদ দেয়, দোকানে জিনিস কিনলে যেমন দেয়। দৈবাৎ রসিদটা কার যেন পকেটে ছিল, তাতে একটা ফোন নম্বর রয়েছে। সারাদিন ফোন করে করে সেই নম্বরে কেবলি "নো-রিপ্লাই" হল।

এদিকে আমাদের ট্যাক্সিচালক সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা শেষ-যাত্রী এক বৃদ্ধাকে ট্যাক্সি থেকে নামাবার সময় হঠাৎ দেখলে পিছনে একটা ক্যামেরা। সে হাঁক দিয়ে বললে—আপনার ক্যামেরাটা ফেলে যাচ্ছেন। বৃদ্ধা বললে—আমার তো নয়। ট্যাক্সিচালক মহা ফাঁপরে পড়ল। সারাদিন এত অসংখ্য লোক ওঠা-নামা করেছে। কিছুতেই মনে পড়ে না কার হতে পারে। শেষে বাড়িতে ফিরে এসে ফিলমটা খুলে ফেললে। ভাবলে ফিলমটা ডেভলপ করতে দেওয়া যাক, কোন চেনা লোকজনের চেহারা ছবিতে দেখলে হয়ত কিছু বুঝতে পারা যাবে। এমনি সময় টেলিফোন বাজল। টেলিফোন পেয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। ট্যাক্সি চালিয়ে এসে ক্যামেরা পেঁৗছে দিয়ে গেল।

ফরেন পলিটিকস্ ইনস্টিটিউটে যেদিন প্রথম গিয়ে হাজির হলাম, লাইব্রেরিয়ান মেমসাহেব বললে, কোন্ 'বোস' ফাইল দেখতে চাও? আমাদের দুটো আছে—বোস সুভাষচন্দ্র আর বোস শরৎচন্দ্র। বললাম, দুটোই চাই। এদের কাছে রয়েছে প্রধানত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র বা সংবাদপত্র সংস্থার খবরাখবরের রিপোর্টের বিরাট সংগ্রহ। জার্মান, ইটালিয়ান, জাপানী ও ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে একই খবর বিভিন্ন ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ সংবাদপত্র টাইমস্ বা ডেইলি মেলের বিদ্বেষপ্রসূত খবরগুলো আমাদের খুব কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছিল। ইনস্টিটিউটের কর্মী এক অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘাঙ্গী মহিলা আমাদের কপি করার কাজে সাহায্য করেছিলেন। এখানকার Xerox কপি করার যন্ত্রটি আরো উন্নত ধরনের ও আধুনিক। কিছু কিছু কাগজপত্র বাছাই করে কপি করে নেওয়া হল।

কথা ছিল কলাকেন্দ্রের সেক্রেটারী শ্রীমতী উটে বাওয়েন ওখানকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা Der Spiegel —অনেকটা আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিনের মত—দেখাতে নিয়ে যাবেন। কি কারণে যেন অসুবিধা উপস্থিত হল। সপ্তাহের সেদিনটি Spiegel প্রকাশের দিন। ভাল করে কথা বলার ফুরসৎ অফিসের কর্মীদের হবে মনে হয় না। অতএব শ্রীমতী উটে আমাদের 'Bild-Zeitung' কাগজের আপিসে নিয়ে গেলেন। এই পত্রিকা চাঞ্চল্যকর ও মুখরোচক সংবাদের জন্য খ্যাত। 'বিলড্ সাইটুং' ওখানকার সব চাইতে পপুলার কাগজ।

'বিলড্ সাইট্ং' পত্রিকার পলিটিক্যাল ডেসকের মিঃ এগন্ ফ্রাইহাইট আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ওদের কাগজের সংবাদ পরিবেশন ভঙ্গী উনি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—একটা ঘটনা ঘটল, তৎক্ষণাৎ ঘটনার নেপথ্যে কি আছে রিপোর্টাররা তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের দেশে লোকে প্রধানত খবরের কাগজ পড়ে রাজনৈতিক খবরাখবরের জন্য, সেনসেশন বা স্ক্যান্ডালের জন্য নয়—একথা বলাতে ফ্রাইহাইট বললেন, তা কি করব বলো! আমাদের কাগজের পক্ষে ঐ লাইন নেওয়া সম্ভব নয়। কাগজে-কাগজে প্রতিযোগিতা এখানে তীব্র। শুধু সংবাদ-পাঠের জন্য যে কাগজ তা লোকে সকালবেলা পড়ে নেয়। আমাদের সান্ধ্য পত্রিকা লোকে কাজের শেষে বাড়ি ফিরবার পথে বিলড্ সাইট্ং নিয়ে যায়। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমাদের বড় বড় হেডলাইন, নানা রকম উত্তেজনার খোরাক যোগাতে হয় বইকি। গল্প শুনছিলাম, এক ভারতীয় দম্পতি একদিন মোটরে করে হামবুর্গের রাজপথে চলেছেন, পথে ধাক্কা লাগল এক উটের সঙ্গে। হ্যাঁ, উট। হামবুর্গে সে সময় এক সার্কাস দল এসেছিল। বাড়িতে ফিরতে-না-ফিরতেই বিলড্-সাইট্ং থেকে টেলিফোন পেলেন ওঁরা।—'ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল—উটের বেশী আঘাত লাগল না মোটরগাড়ির ক্ষতি হল বেশী?'

ফ্রাইহাইটের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সামান্য দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকা হাউসে পেঁছে দেখি নেতাজী-সভায় সকলে এসে গেছেন। পুরোন দিনের লোকেদের মধ্যে আছেন ধাওয়ান—ইনি ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর আছেন প্রফেসর অলস্ওয়ার্থ, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও একজন 'ইণ্ডিয়া একসপার্ট' হিসেবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফরেন অফিসের কাগজপত্রে দেখেছি ডাঃ অলস্-ওয়ার্থ ও ডাঃ মেলচার্সকে একটা ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হচ্ছে। কমিটির অন্য সদস্যারা হলেন কাউণ্ট পডউইল, ফন্ স্মিডেন ও কনসাল জেনারেল ন্যাপ। এই কমিটিকে ভার দেওয়া হয়েছে, চল্লিশ পাতার মত একটি রিপোর্ট ব্রিটিশদের ভারতশাসনের পদ্ধতির ওপর করতে হবে। কি কি বিষয়ে জানতে হবে তার দু' একটি উল্লেখ করছি।

এক, মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের পক্ষে কিভাবে এত বড় একটা বিরাট দেশ, যার জনসংখ্যাও বিপুল, শাসনাধীন রাখা সম্ভব হল। দুই, বলা হচ্ছে "Especially important would be the exploration of the British arts of divide et impera" ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে জার্মানদের আগ্রহ জন্মেছে। এছাড়া অবশ্য গান্ধী, বোস ও কংগ্রেস সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হচ্ছে।

সব সময় যে এত গুরুতর বিষয়ের জন্যই 'ইণ্ডিয়া একস্পার্ট' দরকার হতো তা নয়। নাম্বিয়ার বলছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জার্মানদের অজ্ঞতা ছিল অসম্ভব। এই সব ইণ্ডিয়া একস্পার্টের কথা হতে হতে নাম্বিয়ার একটা মজার গল্প বললেন। আবিদ হাসান তখন ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে তরুণ কর্মী। লক্ষ্য করা গেল, একটি বিশেষ জার্মান বান্ধবীর সঙ্গে হাসানকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। এমনিতে য়ুরোপে এ ধরনের মেলামেশায় অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না। কিন্তু একই বান্ধবীর সঙ্গে সর্বদা ঘুরলে তার অন্য রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। নাম্বিয়ার একদিন হাসানকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার আবিদ? এটা কি সিরিয়াস কোন অ্যাফেয়ার? হাসান প্রথমে কথাটা ধরতে পারেননি, তারপর হো-হো করে হেসে বললেন—আরে, না, না। এই মেয়েটিকে আমি একবার ভারতবর্ষের মহারাজা, ফকির, বাঘ, সাপ ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। বারে বারে বান্ধবী পাল্টানো মানেই আবার

সেই গোড়া থেকে শুরু করা, আর এক প্রস্ত সাপ, বাঘ, ফকির, মহারাজা ইত্যাদি। আমি তাই ঠিক করেছি এই একজনের সঙ্গেই এখন অনেকদিন লেগে থাকব।

আমেরিকা হাউসের নেতাজী-সভায় বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবিটি ছাড়াও নূতন সংযোজন হল জার্মান টি ভি তথ্যচিত্রটি। এই টেলিভিশন ডকুমেন্টারিতে ক্ল্যারিটা ফন, ট্রট, সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন মুসেমবার্গ, অগেহানন্দ, ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার, শ্রীমতী এমিলি, বালকৃষ্ণ শর্মা—সকলের সঙ্গে দীর্ঘ ইন্টারভিউ ছবিটিকে একাধারে তথ্যসমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

এমন সুন্দর তথ্যচিত্রটির শেষ দৃশ্যটি শুধু আমাকে একটু পীড়া দিয়েছিল। টুকরো টুকরো জীবন্ত ডকুমেন্টারি, সেখানে নেতাজী হাঁটছেন, চলছেন, কথা বলছেন, তারপর এতজন সহকর্মীর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, তারপর শেষ দৃশ্যে এল কি? দাক্ষিণাত্যের কোথায় যেন পূজার শোভাযাত্রা চলেছে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে চলেছে লোকজন। দেখা গেল শোভাযাত্রার পুরোভাগে এক গণেশ মূর্তি, আসলে সেটি সামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত নেতাজীর মূর্তি—কিন্তু সামনে গণেশের শুঁড়—যেন মুখোশের মত নেতাজীর মুখের ওপর সেঁটে দেওয়া। সেখানেই সহসা ছবি শেষ।

কিছুকাল আগে রূপদর্শী তাঁর সংবাদভাষ্যে ১৯৩৭ সালের নেতাজী জন্মতিথি পালনের যে কাল্পনিক রিপোর্ট "১৯৩৭ সালে প্রকাশিতব্য সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পৃষ্ঠা থেকে" উদ্ধৃত করেছিলেন, তাতে তিনি নেতাজী মূর্তির ভ্যারাইটির একটি দীর্ঘ লিস্ট দাখিল করেছিলেন। তাতে ছানার নেতাজী, ক্ষীরের নেতাজী, নেতাজী ঘোড়ার পিঠে, নেতাজী ট্যাংকের মাথায়—এমনকি নেতাজীর কোলে মুজিব, নেতাজীর কাঁধে জ্যোতিদা ইত্যাদি এক ভয়াবহ দীর্ঘ তালিকা ছিল। সেই লেখাটি পড়তে পড়তে টি ভি ডকুমেন্টারির এই দৃশ্যটি আমার মনে পড়ছিল।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, অনেক য়ুরোপীয় দর্শকের দৃশ্যটি বেশ ভাল লাগল। আমার সমালোচনা শুনে তারা বললে—কেন, এ তো বেশ সিমবলিক, উনি একটা লিজেণ্ড, একটা রূপকথায় পরিণত হলেন, গড হয়ে গেলেন, আমাদের মত সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আর রইলেন না। এই ইঙ্গিতের ওপর ছবিটি শেষ হয়ে গেল, এতে দোষের কি আছে?

সভার শেষে সবাই একসঙ্গে একটা ডিনার হয়ে হামবুর্গের প্রোগ্রামের 'গ্র্যাণ্ড ফিনালে' হবে এই রকম কথা ছিল। আমেরিকা হাউস থেকে পর পর কতকগুলি গাড়ি একটা আর একটাকে ফলো করে বেরিয়ে গেল—উদ্দেশ্য কোন এক চাইনিজ রেস্তোরাঁ। মিস সুন্দরম আমাকে তার গাড়িতে তুললেন—কিছু দূর এসে হঠাৎ আমরা চমকে উঠে দেখলাম, আমরা ভুল গাড়ি অনুসরণ করে সম্পূর্ণ দলছাড়া হয়ে গেছি। ঠিক কোথায় যেতে হবে দু'জনের কেউ-ই জানি না। মিস সুন্দরম সভার কাজ, প্রোজেকশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। ডিনারের আয়োজনের ভার ছিল মিস উটে বাওয়েনের ওপর। আবছা মত যেন শুনেছিলাম হামবুর্গার স্ট্রাসেতে জায়গাটা কোথাও হবে। রাত এগারটায় হামবুর্গার স্ট্রাসেতে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে আমরা ভগ্নহৃদয়ে এবং ক্ষুধার্ত হয়ে আমাদের নরসকে ক্রুবে ফিরে এলাম।

ফিরে আসতেই টেলিফোন বেজে উঠল—সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ডিনার টেবিলে বসে আছে। কি হল আমাদের, কোন অ্যাকসিডেণ্ট হল নাকি? এবার ভাল মত পথনির্দেশ,—জায়গাটার নাম "লঙ-ফঙ"। কি করে কথাটা বলি, দ্বিতীয়বারও পথ হারালাম। পথের ধারের টেলিফোন বুথ থেকে 'লঙ-ফঙে' খবর

দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওই নামে কোন রেস্তোরাঁ টেলিফোন বইতে নেই। রাত বারোটার পর দু'জনে গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির পথ ধরেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল নিওন আলো ঝলমল করছে, জ্বলছে-নিভছে—বড় বড় করে লেখা "ফঙ-লঙ"। মিস সুন্দরম মাই গড বলে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন। এই লঙ-ফঙ—ফঙ-লঙ ঘটিত গোলমালের ফলে ডিনারটা একটু অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স মত হল বটে, তবে বেশ কিছুদিন প্রচণ্ড জার্মান এফিসিয়েনসির মধ্যে কাটিয়ে এই একটুখানি গণ্ডগোলে আমার তো বেশ আরাম বোধ হল।

॥ পনর ॥

লণ্ডনে আমরা ভারতীয়রা খুব একটা ওয়েলকাম অতিথি নই, একথা সকলেরই জানা। হিথরো এয়ারপোর্টে নামতে ইমিগ্রেশন কাউণ্টারে এক বিরস বদন, লম্বা-চুল ইংরেজ ছোকরা বসে আছে। আমাদের ইংলণ্ডে আসার উদ্দেশ্য কি এবং আমরা কতদিন থাকব তা এইখানে নিবেদন করার কথা। নিঃশব্দে ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরির চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলাম। ওদের দেশে চিরস্থায়ী বসে যাবার কোন বাসনা আমাদের নেই দেখে ছোকরা সাহেবের মুখে হাসি ফুটল। হেসে বললে—ডোনট্ ওয়ার্ক টু হার্ড, এনজয় ইওরসেলফ!

কিন্তু যে ক'দিন ইংলণ্ডে ছিলাম মোটের উপর বেশ খাটুনি গেল। কারণ হাতে যা সময়, তুলনায় কাজ অনেক বেশীই ছিল। রোজই সকালে ব্রেকফাস্টের পর সোজা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে হাজির হতাম। দুপুরে চট করে একবার বেরিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া, ফাইলের পাতায় চিহ্ন দেওয়া থাকত, ফিরে এসে আবার সেখান থেকে কাজ শুরু। বাড়ি ফিরতে রাত হতো রোজই। কিতু এই হার্ড ওয়ার্কের ভেতর আনন্দও পেয়েছি প্রচুর।

প্রথমত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কাগজপত্র ঘাঁটা একটা অভিজ্ঞতা। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল। পঁচিশ বছরের স্বাধীনতায় পরাধীনতার দিনগুলির অনেক স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল, অনেক কথাই আবার ফিরে মনে পড়ল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির আর্কাইভিস্ট মিঃ মার্টিন ময়ার সব কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রথম দিন গিয়েই দেখি স্পেশ্যাল রিডিং রুমে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ফাইল গুছিয়ে রাখা আছে। ময়ার সাহেব তাঁর লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে (বর্তমান ব্রিটিশ ইনটেলেকচুয়ালদের সকলেরই লম্বা চুল, য়ুরোপেও লম্বা চুল ফ্যাসন হলেও তার দৌরাত্ম্য ও দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম) প্রায়ই এসে খোঁজখবর নিয়ে যেতেন সব ঠিকমত হচ্ছে কিনা। লাইব্রেরিয়ান সাটল সাহেবও আমাদের কাজে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে আমাদের একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার হল অধ্যাপক ওটেনের সঙ্গে। য়ুরোপে তথ্যের সন্ধানে ঘুরতে গিয়ে প্রায়ই সিনেমার ফ্ল্যাশ ব্যাকের মত আমাদের ফিরে যেতে হতো ১৯৩৩, '৩৪ বা '৩৫ সালে। কিন্তু ওটেন সাহেব আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে ১৯১৬ সালে।

আমাদের ইংলণ্ডের প্রবাসজীবন আরো বিচিত্র হয়ে উঠল কিছু ইতিহাসের ছাত্র গবেষকের সঙ্গে যোগাযোগে, সাংবাদিক সংস্পর্শে আর বাংলাদেশের ছায়া তো সর্বত্রই আমাদের অনুসরণ করছিল।

আমাদের লণ্ডনে আসার খবর পেয়ে প্রথমেই এসে উপস্থিত হল লিওনার্ড

গর্ডন। গর্ডন একজন আমেরিকান স্কলার, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করেছে, বর্তমানে কলাম্‌বিয়া য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছে। সম্প্রতি গর্ডনের সুদীর্ঘ থিসিস 'Bengal and the Indian National Movement' রিসার্চ ব্যুরোর দপ্তরে এসেছে।

প্রচুর খেটে গর্ডন তার ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও বাংলাদেশ পেপারটি করেছে। মোটামুটি এটি তিনটি পর্বে ভাগ করা। প্রথম পর্বে আছে কংগ্রেসের গোড়াকার দিনগুলির কথা, রমেশচন্দ্র দত্তর কথা। দ্বিতীয় পর্বে অরবিন্দ ঘোষ ও স্বদেশী আন্দোলন। তৃতীয় ও শেষ পর্বটির নাম "বাংলা ও গান্ধী" এবং এই পর্বে যে দুটি মাত্র অধ্যায় আছে তার নামেই বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাবে। একটি অধ্যায় "চিত্তরঞ্জন দাশ : অসহযোগ ও স্বরাজ্য দল"—অপর অধ্যায়টি "সুভাষ বোস, কংগ্রেস ও বাংলার রাজনীতি।" এই শেষ অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বেশ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হয়েছে।

লণ্ডনে গর্ডনের সঙ্গে ওর মূল্যায়ন নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। সুভাষ-চন্দ্রের চরিত্রের একটি বিপরীতধর্মী ভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গর্ডন বলছে, ও'র মধ্যে একই সঙ্গে 'good boy' এবং "mischief-maker' এই দুই ভাবের সংমিশ্রণ ছিল। ও'র ভিতরে যেমন একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল তেমনি নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ছিল সহজাত। ও'র বাল্যকালে ও কৈশোরে এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব বেশ ফুটে ওঠে। গান্ধী-বোস সংঘর্ষ সম্পর্কে গর্ডন বলে, গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উনি রুখে দাঁড়ালেন ও জয়ী হলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি গান্ধী-নেতৃত্ব অস্বীকার করতে পারলেন না। ত্রিপুরিতে অত বড় জয়ের পরও সেই কংগ্রেস থেকে ও'কে সরে দাঁড়াতেই হল। ওর মত— "The Boses won the first battle but lost the war." অবিভক্ত বাংলার নানা রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যেই পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে দুই বাংলার সঙ্গে দুই কেন্দ্রের তিক্ত সম্পর্কের বীজ নিহিত আছে একথা আলোচনা করে ও বলেছে, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রবলেম্‌ এরিয়া হিসেবেই রয়ে গেছে।

লেনি গর্ডনকে অবশ্য কলকাতার অনেকেই নিশ্চয় মনে রেখেছেন। কয়েক বছর আগে কলকাতায় রিসার্চের কাজ করার সময় চারজন বাঙ্গালী সম্বন্ধে ও বিশেষভাবে পড়াশুনো করছিল—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, এম এন রায় এবং সুভাষচন্দ্র। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। সে যাই হোক, তার রিসার্চের চরিত্র যারা, তাদের প্রতি সে একান্ত অনুগত হয়ে পড়ছিল। এদের কারু সম্বন্ধে অপরের অজ্ঞতা বা অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনা ও সহ্য করতে পারত না। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওর এই একাত্মভাব অনেক সময় লোকের কৌতুককর মনে হতো। একবার দিল্লি থেকে এক বন্ধু কলকাতায় এলেন। লেনি তখন দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভস-এ কাজ করছে। আমরা বললাম, গর্ডনকে দেখলে নাকি ওখানে? সে বললে, 'হ্যাঁ, ওখানে নেতাজীর একস্‌-রে প্লেট সব স্টাডি করছে। তার মানে? আমরা একটু অবাক হই! জেলে থাকার সময় নেতাজী অসুস্থ হয়ে পড়লে যেসব একস্‌-রে তোলা হয় তা ন্যাশনাল আর্কাইভস-এ রয়েছে। লেনিকে দেখা গেছে নিমগ্ন চিত্তে সেইসব একস্‌-রে প্লেট ঘাঁটছে।

লেনি গর্ডন আমাদের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কাগজপত্র সম্বন্ধেও দরকারী খবরাখবর কিছু দিলে। যেমন, ওটেন সাহেবের ওপর কাগজপত্র গর্ডন বলে না দিলে আমরা হয়ত দেখতেই পেতাম না। ময়ার সাহেব আমাদের জন্য বোস পেপারস্‌

সব বার করে রেখেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী আমরা ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত দেখতে পারি, অতএব ১৯৪২-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত কাগজপত্র দেখতে পেরেছিলাম। গর্ডনের কাছে ওটেন পেপারের কথা শুনে, চাইবার পর ময়ার সাহেব ওটেনের ওপর আলাদা ফাইল এনে দিলেন।

মার্কিন স্কলার গর্ডন ছাড়া অপর যে উৎসাহী স্কলার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কেম্ব্রিজ থেকে ছুটে এলেন তিনি চেক—নাম মিলান হাউনার (Hauner)/ হাউনার গবেষণা করছেন য়ুরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের উপর। ও'র থিসিস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা থাকতে থাকতেই হাউনার অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কেম্ব্রিজ থেকে অক্সফোর্ডে চলে এলেন।

লণ্ডনে আমার গৃহস্বামী কীর্তি নিজে একজন ইতিহাসবিদ্, লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েনটাল স্টাডিজ-এ অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপনা করছে। প্রধানত কীর্তির উৎসাহে লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা হল। সেখানে আমাদের সঙ্গে যারা যোগ দিল, তাদের মধ্যে ছিল গর্ডন ও তার একাধারে কাজের সহকারিণী ও বাগদত্তা বধূ সুজী। আর এল হাউনার ও তার সুন্দরী চেক স্ত্রী ম্যাগডালেনা। ভারী সুন্দর, পূর্ব য়ুরোপীয়ান চেহারা, আর কথাবার্তাও খুব মধুর। মিসেস হাউনার ওরিয়েণ্টাল স্কুলেরই আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগে কাজ করেন।

গর্ডন ও হাউনার দুজনের দু ধরনের প্রবলেম্। সত্তর সালের আগস্ট মাসে যখন প্রাগের রাস্তায় ট্যাংকের গর্জন শোনা গেল, হাউনার ঘটনাচক্রে সে সময় লণ্ডনে ছিল। নানা কারণে ওর আর প্রাগে ফেরা হয়ে উঠবে মনে হয় না।

গর্ডন তার দ্বিতীয় রিসার্চ প্রজেকট্ আধুনিক বাংলার ইতিহাস (১৯০০-১৯৫০) নিয়ে কাজ শুরু করবে বলে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে ভারতবর্ষ যাবার পথে লণ্ডনে এসেছে। নেতাজীর ওপর আলাদা একটি বই লেখার পরিকল্পনাও ওর রয়েছে। এদিকে নেতাজী সম্বন্ধে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর শরৎ বোস পেপারস্ ওর চোখে পড়েছে। এ নিয়ে যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ আছে বলে ওর ধারণা।

এখানে এসে এক বিভ্রাট। ভারত সরকার কিছুতেই ভিসা দিচ্ছেন না। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস বয়ে যাচ্ছে। গর্ডনের স্টাডি লিভ শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু ভিসা নেই। লণ্ডনের হাই-কমিশন দিল্লীকে জিজ্ঞাসা করছে, দিল্লী অনুমতি চাইছে কলকাতার। শোনা গেল, কলকাতাতেই ব্যাপারটা আটকে আছে। এই আটকে থাকার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, না রাইটার্স বিল্ডিংস-এর গড়িমসি এর জন্য দায়ী তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গর্ডন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এর মধ্যে আমি ঠাট্টা করে বলে বসলাম, কেনই বা আমরা তোমাকে ভিসা দেবো? যা দুর্ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করছে তোমাদের গভর্নমেন্ট! গর্ডন চটে গিয়ে বললে—তুমি কি আমাকে শাস্তি দিয়ে নিকসনকে শিক্ষা দিতে চাও? এটা কি ন্যায়সঙ্গত? তাছাড়া জেনে রাখো, আমেরিকার অ্যাকাডেমিক মহল পুরোপুরি ভারতবর্ষের দিকে এবং বাংলাদেশের সমর্থক। মিছিমিছি খারাপ ব্যবহার করে মানুষের গুডউইল বা সদিচ্ছা নষ্ট করো না।

গর্ডনকে শান্ত করতে আমরা বললাম, আহা চটো কেন! নিশ্চয় ছোট্ট কোন আমলাতান্ত্রিক জট পাকিয়েছে তোমার কেস নিয়ে। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নেতাজী তথ্যচিত্রটি নিয়ে য়ুরোপ যাত্রার শুরুতে যে বিভ্রাট বেধেছিল সেই গল্প বলি। আর একটু হলে আজ আর লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েনটাল স্টাডিজ-এ বসে

এই ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ হতো না।

নেতাজী-ইন-অ্যাকশন ছবিটি যথারীতি সেনসার করা ও শিক্ষামূলক ছবি হিসেবে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। কলকাতার বহুলোক রবীন্দ্রসদনে ও নেতাজীভবনে এটি দেখেছেন। তবু য়ুরোপে নেতাজী সম্মেলনে ছবিটি নিয়ে যাবার আগে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো দিল্লীতে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি চাইবার প্রয়োজন হয়ত ছিল না, তবু ব্যুরোর কর্তৃপক্ষ 'কারেকট্' হতে চাইলেন। পররাষ্ট্র দপ্তর জানালেন, আমাদের করণীয় কিছু নেই, তথ্য ও বেতার দপ্তরকে জানিয়ে রাখো। বেশ, তাই করা হল। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল, দুই দপ্তরই নীরব। ধরে নেওয়া হল মৌনতা সম্মতিরই লক্ষণ। এরপর আমাদের যাবার দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, প্রায় এরোপ্লেনে উঠব-উঠব করছি, তখন হঠাৎ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক অফিসারের পত্রাঘাত—নেতাজী ফিলমটি দিল্লী নিয়ে এসে আমার অফিসার-দের দেখাতে হবে, তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখব ওটি য়ুরোপে নেওয়া চলবে কি না। সর্বনাশ!

তখন হাতে সময় এত সংক্ষিপ্ত যে ইচ্ছা থাকলেও এ আবদার রাখা সম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে আমাদের কর্মব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাটি জানিয়ে রিসার্চ ব্যুরো থেকে চিঠি দিতে হল। তখন সেই চিঠি ডাকে দিল্লী পাঠিয়ে জবাব আনাতে হলে এরোপ্লেন ফেল হয়ে যাবার উপক্রম। সিদ্ধার্থশংকর রায় সে সময় পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কলকাতা-দিল্লী বলা যায় ডেলি-প্যাসেনজারি করেন। সেদিনই দিল্লী যাচ্ছিলেন, কোনমতে ওঁর ব্যাগে চিঠিটি গুঁজে দেওয়া হল। কলকাতায় তখন রয়েছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের অশোক রায়। উনিও একটা টেলেকস্ পাঠালেন। নেতাজী ফিলম অ্যাকাডেমিক সম্মেলনে য়ুরোপে প্রদর্শিত হবে এর জন্য অনুমতির কি আছে উনি তো ভেবে পেলেন না। যাই হোক, পরদিনই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে টেলিগ্রামে জবাব এসে গেল—অবশ্যই ছবিটি নেওয়া চলবে।

এর পরের অংকে নাটক আরো জমেছিল। এরপর যে চব্বিশ ঘণ্টা কলকাতায় ছিলাম তার মধ্যে কয়েকঘণ্টা অন্তর অন্তর একটা করে অনুমতি পত্র টেলিগ্রামে আসতে লাগল। একবার পররাষ্ট্র দপ্তর, একবার তথ্য ও বেতার দপ্তর—সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগল, ছবিটি অবশ্যই নেওয়া চলবে।

দেশে ফিরে আসার পর গর্ডন আমাদের জানিয়েছে, তার ভিসার আবেদন একে-বারেই নামঞ্জুর হয়েছে। এর জন্য কোন কারণ অবশ্য বলা হয়নি। খবরটা শুনে একটু দুঃখিত না হয়ে পারিনি। ওর প্রকাশিত থিসিস যা দেখেছি, তা সত্যিই সুচিন্তিত ও সুলিখিত। আধুনিক বাংলার ইতিহাসের ওপর আর একটি ভাল রচনার থেকে বোধ হয় আমরা বঞ্চিত হলাম। অবশ্য নেতাজীর জীবনী লেখার আশা ও এখনো ছাড়েনি।

সেদিন ওরিয়েনটাল স্কুল থেকে বেরিয়ে য়ুনিভার্সিটি এলাকাতেই একটা সস্তা রেস্তোরাঁয় বসে টমাটো সস্ সহযোগে স্প্যাগেটি খেতে খেতে হাউনার, গর্ডন, কীর্তি সবার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। পরদিন সকালে আমাদের অক্সফোর্ড যাওয়ার কথা নীরোদ চৌধুরী মশাইর সঙ্গে দেখা করতে। তাই শুনে গর্ডন সাবধান বাণী উচ্চারণ করলে, তবে কাল তোমাদের কপালে একটা অক্সফোর্ডের 'ওয়াকিং ট্যুর' আছে। দিনকতক আগে সুজীকে নিয়ে গর্ডন গিয়েছিল ওঁর কাছে। প্রচুর ভাল খাওয়া-দাওয়া ও বিদগ্ধ আলোচনার পর উনি বললেন যে, এক ঘণ্টায় অক্সফোর্ড ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন। গর্ডন বললে, মিঃ চৌধুরীর হাঁটা তো জানোই, ক্ষিপ্রগতির

সঙ্গে তাল রাখা দায়। সত্যই এক ঘণ্টায় পুরো অক্সফোর্ড ঘুরিয়ে তবে ছাড়লেন। আমাদেরও সেই একই অভিজ্ঞতা পরদিন হল। তবে গর্ডন একটু ভুল বলেছিল—'ওয়াকিং ট্যুর' না বলে 'রানিং ট্যুর অফ অক্সফোর্ড' বলা উচিত ছিল।

॥ ষোল ॥

লণ্ডনে সাংবাদিক বন্ধুরা য়ুরোপে নেতাজী সম্মেলন কেমন হল, বিশেষত পূর্ব য়ুরোপে নেতাজী সম্পর্কে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা কেমন, জানতে উৎসুক ছিলেন। আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের শ্রীতারাপদ বসু দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেললেন। একটি মিটিং হল ইণ্ডিয়া ক্লাবে ইণ্ডিয়া লীগের রিসার্চ ইউনিট-এর উদ্যোগে। সেখানে আমাদের য়ুরোপ সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় একটি সন্ধ্যা কেটেছিল। অন্যান্যদের মধ্যে সাংবাদিক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আর একদিন লণ্ডনের প্রবাসী বাঙালী ও ভারতীয়দের এক সমাবেশে নেতাজী ফিলম দেখানো হল। এই অনুষ্ঠানে লণ্ডনে সে সময়কার বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতারা, আওয়ামী লীগ-এর কর্তাব্যক্তির অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রেস্তোরাঁ 'কোহিনুর'-এ এই উপলক্ষে এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল।

এমনি দু'একটি অনুষ্ঠান ছাড়া আমাদের দিন কাটত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। ওয়াটারলু স্টেশনে নেমে ওল্ড ভিক-এর পাশ দিয়ে 'দি কাট' ধরে হেঁটে চলে গেলে ব্ল্যাকফ্রায়ারস রোডে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি। এ পথে ছিল আমাদের নিত্য যাতায়াত।

ফাইলের পাতা উলটিয়ে দেখছি প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর বাংলার লাটসাহেব রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন দিল্লীতে ভাইসরয়-এর কাছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবরাখবর সহ সুদীর্ঘ এই সব রিপোর্ট তৈরী করছেন ছোট লাটসাহেবের সেক্রেটারি বড়লাট সাহেবের সেক্রেটারির জন্য। আর সঙ্গে ছোটলাটসাহেব চিঠি দিয়ে দিচ্ছেন বড়লাট সাহেবকে। এই রিপোর্টগুলিতে রয়েছে ভারতের অনেক অজ্ঞাত ও অলিখিত ইতিহাস। মাঝে মাঝে সেক্রেটারির নাম পালটে যাচ্ছে, লাটসাহেব বদল হচ্ছে, রিপোর্টের বিষয়বস্তুর চরিত্র পালটাচ্ছে। কিন্তু কি বলব, প্রতিটি রিপোর্টে অন্তত দুটি করে অনুচ্ছেদ দখল করে সদাসর্বদা বিরাজ করছেন সুভাষচন্দ্র বোস।

পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ইংরেজদের জন্য অনুকম্পা হয়। কি উৎপাতটাই না করছেন সর্বক্ষণ। ইংরেজ শাসকের সদা সন্ত্রস্ত ভাবটি ফুটে উঠছে, কখন কি মতলব আঁটছেন কে জানে, বিশ্বাস নেই এতটুকুও।

ত্রিশ দশকে নেতাজী যে সময় য়ুরোপে ঘুরছেন—ওঁর সব ঘোরাফেরা সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। সত্যিই শরীর খারাপ? য়ুরোপে না হলে চিকিৎসা হয় না? তারপর ভিয়েনাতে চিকিৎসার অনুমতি তো দেওয়া হয়েছে, তাতেও কুলোচ্ছে না। কখনো চেকোশ্লোভাকিয়ার উষ্ণ জলের ঝর্নার জল চাই, কখনো জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্টের হাওয়া খাওয়া চাই—আবদারের সীমা নেই। তারপর এ যে একেবারে সিংহের গুহায় ঢুকতে চায়, ইংলণ্ডে আসতে চায়। সর্বনাশ, কিছুতেই যেন না ঢুকতে পারে। এরই মধ্যে নেতাজী ঘুরে চলে গেলেন অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানী। ইংরেজদের বিশেষ ভয় নেতাজীর বার্লিন ও লণ্ডন এই দু জায়গায় যাওয়া নিয়ে। লণ্ডন ও বার্লিনে অনেক ভারতীয় ছাত্র আছেন। ওদের

ধারণা এইসব ছাত্রদের উনি প্রভাবান্বিত করবেন। য়ুরোপের সব ব্রিটিশ কনস্যুলেট-এ সার্কুলার পাঠানো হল এই ডেঞ্জারাস ব্যক্তি সম্বন্ধে সাবধান করে।

ত্রিপুরি কংগ্রেসের ঠিক আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্রিটিশ শাসকেরা খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। সুভাষচন্দ্র জয়ী হবার পর কোন একটি প্রদেশের গভর্নরের কাছ থেকে বেশ কৌতূহলপ্রদ রিপোর্ট রয়েছে। এ বি সি ডি—পয়েণ্ট করে অনেক খবর দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। দু' একটি নমুনা এই রকম—

(এ) "রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বোসের জয়লাভ গান্ধী-প্যাটেল অ্যান্ড কোম্পানীকে অবাক করে দিয়েছে।"..

(এইচ) "গান্ধীর সঙ্গে কোন কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও নেহরু ব্যক্তিগত-ভাবে গান্ধীর একান্ত অন্তরঙ্গ, বোসকে সংযত করতে নেহরু তার প্রভাব বিস্তার করবেন।"

এই রিপোর্টের শেষ দিকটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। নির্বাচনের ঠিক আগে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির পিছনে ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের সঙ্গে ফেডারেশন নিয়ে একটা বোঝাপড়ার জন্য আলোচনার চেষ্টা কংগ্রেসের কোন কোন মহল থেকে চলছে। এই মন্তব্য নিয়ে ঘোরতর বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডে সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীরা বললেন রাষ্ট্রপতি তাঁদের প্রতি 'aspersion caste' করেছেন। সুভাষচন্দ্র এই মন্তব্য প্রত্যাহারও করলেন না, ক্ষমাও চাইলেন না। রাগ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন দক্ষিণপন্থী পদত্যাগ করলেন। এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্রের অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। ওরা রিপোর্ট দিচ্ছে, এই সময় যদি গান্ধী ও ভাইসরয়ের মধ্যে একটা আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তো খুব ভাল হয়। নয়ত বোস ও তার বামপন্থী অনুগামীরা যদি পুরোপুরি ক্ষমতায় এসে যায় তখন এই বোঝাপড়ার চেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়বে। ওদের সংবাদদাতা (তার নাম করেই বলা আছে) বলছেন, গান্ধীজী সরাসরি ভাইসরয়ের সঙ্গে অথবা তাঁর কোন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় রাজী আছেন। মধ্যস্থ হবার জন্য আগা খাঁর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারজন সদস্যের পদত্যাগের ব্যাপারটা নিয়ে আর একটি কৌতূহলপ্রদ নোটের ওপর চোখে পড়ল। নোট দিচ্ছেন এ. ডির্বাডন (Dibdin), একজন ডিপার্টমেণ্টাল সেক্রেটারি। বারজন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু নেহরু যে ঠিক কি করেছেন তা বোঝা গেল না। উনি সকলের সঙ্গে একযোগে পদত্যাগ করলেন না। তার জন্য যদিও ও'র ওপর যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সুভাষচন্দ্রের সমর্থনেও এলেন না। আলাদা করে একটা বিবৃতি দিলেন যা কিনা পদত্যাগেরই সামিল বলে গণ্য হল। এই পুরো গোলমেলে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ডিবডিন মন্তব্য করছেন—

"The first strikes me as the work of people who have no compunction in ranking themselves as enemies of Bose, the second (Nehru's) as usual savours of a man who is not quite sure of his own mind."

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি ট্র্যাজিক অধ্যায়ের কথা এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। ও'র বিবৃতির অর্থই হল পদত্যাগ—একথার জবাবে নেহরু বলেন 'not quite correct.' আবার একই সঙ্গে স্বীকার করছেন 'and yet......correct enough.' নেহরুর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার বলেন, যদিও মনে হয় নেহরু কংগ্রেসের ওল্ড গার্ডদের দলে চলে গেলেন, প্রকৃতপক্ষে এই

সময় উনি সুভাষচন্দ্রের নিকটতর ছিলেন।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জেলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তাতেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিরক্ত। ছোট লাট হার্বার্ট ভাইসরয় লিনলিথগোকে জানাচ্ছেন, জেলে আসার পর সুভাষের ওজন ২৪ পাউন্ড হ্রাস পেয়েছে—"In spite of the fact that he continues to eat gargantuan meals." গারগানটুয়ান খাদ্য খেয়ে কি করে একজনের ওজন ২৪ পাউন্ড কমে যায় তা আমাদের বোধগম্য হল না।

সুভাষচন্দ্রকে এ সময় যেন কিছুতেই জেল থেকে ছাড়া না হয়—দিল্লী থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ আসছে বারে বারে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের কাছে। বলা হয়েছে, জাপানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের যা খবর হাতে আসছে, তারই ভিত্তিতে এই কড়াকড়ি।

জেল থেকেই নির্বাচনে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র। ঢাকা থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, ঢাকা সেন্ট্রাল কনস্টিটুয়েন্সি। কাগজপত্রে দেখছি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নানা ছিদ্র খুঁজছে যদি কোনমতে ওকে ডিসকোয়ালিফাই করা যায়, নির্বাচনে দাঁড়ানো বাতিল করা যায়। ভোটার লিস্টে নাম আছে কিনা অথবা আর কোন খুঁত খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। শেষ পর্যন্ত রিপোর্ট যাচ্ছে যে ডিসকোয়ালিফিকেশনের ব্যবস্থা করা খুব মুশকিল, কারণ ওঁর এলগিন রোডের বাসভবনে ওই একই নামের আদ্যাক্ষর অর্থাৎ এস সি বোস—এই নামের আধ ডজন আত্মীয় আছেন।

দিল্লীর স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হল। ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪০-এ আমরণ অনশনরত সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে হল। দিল্লী এ খবরে বেশ রুষ্ট হল। হার্বার্ট সাহেব ৭ই ডিসেম্বর তাড়াতাড়ি নোট পাঠাচ্ছেন ভাইসরয়ের কাছে, কেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে হল। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানিয়েছেন যে ওঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটেছে। এর ওপর যদি ওঁকে ফোর্স ফিডিং বা জোর করে খাওয়াবার হুকুম দেওয়া হয় তবে তার যা ফলাফল হবে সে জন্য উনি অর্থাৎ জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিন্তু দায়ী হবেন না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই রিপোর্ট ক্যাবিনেটে পেশ করা হলে বাধ্য হয়ে ওঁকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এই পুরোন কাগজপত্রের নাটকে নায়কের ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র হলেও মাঝে মাঝে পার্শ্ব চরিত্রগুলিও বেশ। যেমন, বিভিন্ন মন্তব্য ও নোট থেকে বোঝা যায় ফজলুল হকের ওপর ইংরেজদের মোটেই ভরসা নেই—ওদের মনের মত, কাজের মানুষ হচ্ছেন নাজিমুদ্দিন।

আগস্ট মাসে হার্বার্ট লিখছেন লিনলিথগোকে যে, শরৎচন্দ্র বসু চীফ মিনিস্টারকে (ফজলুক হক) চিঠি লিখছেন, হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনের ধৃত সব বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে—যদি না দেওয়া হয়, তবে তার ফলাফল গুরুতর হবে বলে ভীতিপ্রদর্শনও করেছেন। আমি ফজলুল হককে বলেছি খুব সাবধানে একটা প্রাপ্তি স্বীকার করে চিঠি তৈরী করতে—অবশ্য যদি একান্তই জবাব দিতে হয়। কেন এই পরামর্শ হক সাহেবকে দিতে হল তা ব্যাখ্যা করে বলছেন "as he is capable of making the wildest statements when he puts pen to paper."

লিনলিথগো আছেন সিমলায়। নাজিমুদ্দিন সিমলা যাচ্ছেন। ২৫শে আগস্ট '৪০ সালে হার্বার্ট লিনলিথগোকে লিখলেন—নাজিমুদ্দিন সিমলা যাচ্ছে, ওকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ও ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছে, সব ব্যাপারেই। সুভাষের

প্রসিকিউশন থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ওর ভয়।

দেখা হবার পর লিনলিথগো ফিরে লিখলেন ২৯শে আগস্ট—তাই তো, নাজিমুদ্দিনকে কেমন যেন বিহ্বল অবস্থায় দেখলাম—ইংরেজিতে কথাটা ব্যবহার করেছেন, "in a very wobbly condition." বোস থেকে শুরু করে সব কিছুতে একটা অহেতুক ভীতি। যাই হোক, ম্যাকস্‌ওয়েল ও আমি ওকে যথাসাধ্য মনের জোর দেবার চেষ্টা করেছি।

ব্রিটিশ ইনটেলিজেনস-এর অথবা বলা যেতে পারে সমগ্রভাবে ব্রিটিশ চাতুর্যের বিরাট স্ট্র্যাটেজিক পরাজয় হল সুভাষচন্দ্রের হাতে '৪১ সালের জানুয়ারী মাসে। ঠিক জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ৯ই ডিসেম্বর '৪০-এ সুভাষচন্দ্র চীফ মিনিস্টারকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন ও'র অবস্থাটা এখন ঠিক কি। উনি তো বন্দী নন, অথচ জামিনে খালাসও নন, ওর বিরুদ্ধে মামলা ও অভিযোগও তুলে নেওয়া হয়নি।

এই চিঠি সম্বন্ধে বাংলার গভর্নর হার্বার্ট ভাইসরয় লিনলিথগোকে জানাতে গিয়ে বললেন যে, সুভাষচন্দ্রের প্রতি ও'রা "cat and mouse policy" অনুসরণ করবেন। ১১ই ডিসেম্বর '৪০ তারিখে হার্বার্ট এই 'ক্যাট অ্যান্ড মাউস' চিঠি লেখেন। হার্বার্ট বলছেন, আজ সকালে ক্যাবিনেটে সুভাষচন্দ্রের ৯ই তারিখের চিঠি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে হোম মিনিস্টার উত্তর দেবেন যে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারায় যে অর্ডার ও'র ওপর আছে তা অথবা যে দুটি মামলা ও'র বিরুদ্ধে চলছে তার কোনটিই প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে না। এ বিষয়ে ও'রা আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিয়েছেন। ঠিক হয়েছে সুভাষচন্দ্রের শরীর যেই একটু ভাল হবে অমনি ওকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে। উনি যদি আর একবার হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করেন তো আবার ছেড়ে দিয়ে আবার ধরা হবে। হার্বার্ট আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই "cat and mouse" পলিসি অনুসরণ করা হলে সুভাষচন্দ্রকে নিস্তেজ করে দেওয়া যাবে, আর এ কথাও বুঝিয়ে দেওয়া যাবে যে একটার পর একটা অনশন করে কোনই লাভ হবে না।

পরবর্তী ঘটনা থেকে আমরা জানি সুভাষচন্দ্র সে সময় মোটেই জেলে বসে একটার পর একটা অনশন করার কথা চিন্তা করছিলেন না। তিনি তখন তার জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ৯ই ডিসেম্বরের ঐ চিঠি অথবা ৩রা জানুয়ারীর লিনলিথগোকে লেখা আর একখানা চিঠি মনে হয় অন্তত আংশিকভাবে গভর্নমেণ্টকে বিভ্রান্ত করবার জনাই লেখা। বাংলা দেশে শোভাযাত্রা করার অনুমতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে সুভাষচন্দ্র এত বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন যে মনে হয়, দেশের আভ্যন্তরীণ এইসব সমস্যা ছাড়া উনি আর কিছুই চিন্তা করছেন না। হার্বার্ট সাহেব তাঁর 'ক্যাট অ্যান্ড মাউস' পলিসি কার্যকর করার স্বপ্ন যখন দেখছিলেন তখন হঠাৎই একদিন জেগে উঠে দেখলেন খাঁচা শূন্য। ২৬শে জানুয়ারী '৪১, যেদিন সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ও বিশ্ববাসীর গোচরে এল, সেদিন তিনি কাবুলের পথে ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করছেন।

তাড়াতাড়ি ফাইলের পাতা উল্টে ১৯৪১-এ চলে এসেছিলাম। খুব দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল বাঘা বাঘা ব্রিটিশ আমলারা সুভাষচন্দ্রের কাছে এই কূটনৈতিক পরাজয় কিভাবে গ্রহণ করেছেন। হতাশ হতে হল। যেখানে কুড়ি-ত্রিশ সাল থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর গোছা গোছা নোট বিনিময় হচ্ছে সেখানে এত বড় ঘটনার পর সবাই চুপ। একটি ছোট্ট রয়টারের সংবাদ, ২৭শে জানুয়ারী—সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করেছেন। তারপর ৩০শে জানুয়ারী ভারত গভর্নমেণ্টের কাছ

থেকে ছোট একটি নোট, তার পাশে হাতের লেখায় একটি লাইন—এটি রয়টারের রিপোর্টের কনফারমেশন। তবে কি ঘটনার আকস্মিকতায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বাক্‌রহিত হয়ে পড়েছিল? মার্টিন ময়ারের সঙ্গে কথা হল। ময়ার বললেন, মনে হয় নেতাজীর এসকেপের ওপর আলাদা কোন সিক্রেট ফাইল আছে যা এখানে নেই। অবশ্য ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি শীঘ্রই সমস্ত যুদ্ধকালীন কাগজপত্র 'ওপেন' বলে ঘোষণা করবে, তখন আরো তথ্য বার হওয়া সম্ভব।

অন্তর্ধানের সংবাদে ব্রিটিশ অফিসারদের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল দেখতে পেলে তা নিশ্চয় খুব আকর্ষণীয় হতো। এ খবরে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কি মনোভাব হয়েছিল তা আমরা কতকগুলি টেলিগ্রাম থেকে জানতে পারি। সে সময় বিভিন্ন নেতার কাছ থেকে শরৎচন্দ্র বসুর কাছে অনেক চিন্তাকুল টেলিগ্রাম এসেছিল। এই টেলিগ্রামগুলো ও তার জবাব দুই-ই কম আকর্ষণীয় নয়। যেমন গান্ধীজী খবরাখবর জানতে চেয়ে টেলিগ্রামে লিখলেন— please, wire truth. ট্রুথ জানানো তো সম্ভব ছিল না, জবাব গেল—"circumstances indicate renunciation." রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র যে জবাব দিয়েছিলেন তা কিন্তু ভিন্ন ধরনের। তার শেষ লাইনটি ছিল "Hope he will have your blessings wherever he may be." "সে যেখানেই থাকুক আপনার আশীর্বাদ আশা করি তার উপর থাকবে"—এই কথায় কবিকে কি তিনি কোন ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন?

এর অল্পদিন পর অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন সস্ত্রীক শরৎচন্দ্র। কবিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন অন্য ব্যাপারে। বলেছিলেন—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। রোগশয্যায় শায়িত কবি যখন ব্যাকুলভাবে বললেন, শরৎ, আমি সুভাষের জন্য খুব উদ্বিগ্ন, আমাকে তুমি বলতে পারো। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে সত্য ঘটনা বলেছিলেন। একথা ভাবতে এখন আমাদের ভাল লাগে যে মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ জেনে গিয়েছিলেন সুভাষ ভাল আছে এবং তার অভীষ্ট সাধনে ব্রতী আছে।

আর একটি মূল্যবান দলিলের কথা বলে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কথা শেষ করি। গর্ডন যেমন আমাদের ওটেন সংক্রান্ত কাগজপত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল তেমনি এই দলিলটির খোঁজ দিয়েছিলেন চেক স্কলার মিলান হাউনার। নেতাজী I. C. S. থেকে পদত্যাগ করে সেক্রেটারি অফ স্টেট মণ্টেগুকে ২২শে এপ্রিল ১৯২১-এ যে চিঠি লেখেন সেই পদত্যাগপত্র ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরির দপ্তরে রক্ষিত আছে। কিছুকাল আগে স্টেটসম্যান পত্রিকার লণ্ডন নোটবুকে জেমস কাওলি মন্তব্য করেছিলেন, নেতাজী ঠিক I. C. S. পরীক্ষা শেষ করেননি, অতএব তার I. C. S. থেকে পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। মণ্টেগুকে লেখা এই চিঠিতে নেতাজী স্পষ্ট লিখছেন—আমি আগস্ট ১৯২০-তে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় তাতে মনোনীত হয়েছিলাম। আরো বলছেন, আমি যে একশ' পাউণ্ড ভাতা পেয়েছিলাম, আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়া মাত্র আমি তা ইণ্ডিয়া অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দেবো।

এই চিঠির ওপর অনেক নোট বিনিময় হচ্ছে। কেম্ব্রিজের I. C. S. স্টাডিজ বোর্ডের সেক্রেটারি রবার্টসকে ২৯শে এপ্রিল '২১ এক গোপন চিঠি দিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের মিঃ ফারারড (Ferard) জানতে চাইছেন ব্যাপারটা কি! সুভাষ কি অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে পড়ে গভর্নমেণ্টের চাকুরি করতে চাইছেন না! তবুও উনি লিখছেন, সুভাষ যদি তার সিদ্ধান্ত পালটাতে চান তার জন্য আমি

তাকে কিছু সময় দিতে চাই। রবার্টস পরদিনই জবাব দিলেন, অসহযোগ আন্দোলনই এর কারণ বলে অনুমান করি। তবে সুভাষ জার্নালিজম করতে চায়, রুটিন-বাঁধা জীবন চায় না। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ওকে সময় দেওয়া খুবই ভাল। আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেটস মিঃ ডামবেল (P. H. Dumbell, ৫ই মে রবার্টসকে লিখলেন—সুভাষকে ডেকে পাঠিয়ে কথা বলো, এইভাবে "forfeiting his career"— কেরিয়ার নষ্ট করতে চলেছে। তোমার সঙ্গে কথা না হওয়া পর্যন্ত এই চিঠির ওপর আমি কোন অ্যাকশন নেব না। সুভাষের সঙ্গে "খোলাখুলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ" আলোচনার পর ৭ই মে রবার্টস জানালেন, সুভাষ তার সিদ্ধান্তে অটল, অনেক ভেবেচিন্তে তবেই সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে।

সুভাষের পদত্যাগের ফলে যে শূন্য পদের সৃষ্টি হল সেই পদের জন এস এম ধর আবেদন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষের পদত্যাগ গ্রহণ ও ধরের নিয়োগ সুপারিশ করে P. H. Dumbell চিঠি দিলেন ২০শে মে। ডামবেল স্পষ্ট বলছেন "the influence of the non-cooperation ca" সুভাষের এই পদত্যাগের কারণ। অবশেষে ২০শে জুন '২১ তারিখে ইন্ডিয়া অফিস কাউন্সিল ডামবেলের সুপারিশ অনুমোদন করলেন। সুভাষের পদত্যাগ গৃহীত হল।

॥ সতর ॥

ক'দিন ধরেই ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ওটেন ফাইলটা নাড়াচাড়া করছিলাম। এতে একটা মস্ত সুবিধা হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ওটেন অ্যাফেয়ার'-এর খুঁটিনাটি সব খবরই— ফার্স্ট স্টেটমেণ্ট অব কেস থেকে শুরু করে তদন্ত কমিটি ও তার রিপোর্ট পর্যন্ত—সবই জানা হয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই ঘটনা নিয়ে ওটেন সাহেবের সঙ্গে সরাসরি বেশী কিছু আলোচনা করতে স্বাভাবিক-ভাবেই একটু কুন্ঠিত বোধ করছিলাম। কিছু দিন ধরে চিঠিপত্রে ওটেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ চলছিল। একটা চিঠিতে উনি লিখেছিলেন যে, হ্যাঁ, সে সময়কার স্মৃতিকথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করতে পারেন বইকি। বিশেষ কলেজ কমিটির সামনে সুভাষচন্দ্রের যে 'হিয়ারিং' হয়েছিল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হল, সেই 'হিয়ারিং'-এ উনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই চিঠিতেই উনি লিখেছিলেন, "... .. but I do not wish to rake up painful memories." দুঃখজনক সেই সব স্মৃতি নূতন করে আর মনে করতে চান না।

আর কয়েক দিনের মধ্যেই ওটেন সাহেবের সঙ্গে দেখা হতে চলেছে মনে করে বেশ উত্তেজিত বোধ করছিলাম। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে ওটেন সাহেবের গল্প শুনে আসছি। ও'কে একটা কাহিনীর চরিত্র হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে-ছিলাম। হঠাৎ যদি কোন সুপরিচিত গল্প-উপন্যাসের চরিত্র সজীব হয়ে বই-এর পাতা থেকে উঠে আসে তবে যেমন আশ্চর্য বোধ হয় তেমনি মনের ভাব হচ্ছিল।

একদিন ওয়াটার্লু স্টেশনে নেমে ওল্ড ভিকের পাশ দিয়ে 'দি কাট' ধরে হেঁটে ব্ল্যাকফ্রায়ারস রোডে আমাদের চিরাচরিত পথে আর গেলাম না। অন্যদিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে আর একটা ট্রেনে চেপে বসলাম। যাব ওয়ালটন-অন-টেমস। সেখানে ওটেন সাহেবের বাড়ি। আগেই লিখেছিলেন, কোন্ ট্রেনে আসবে জানালে আমি আর আমার স্ত্রী স্টেশনে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। সাতাশি বছরের বৃদ্ধ,

চোখেও ভাল দেখেন না। এই চিঠি পেয়ে, বলাই বাহুল্য, অভিভূত হয়েছিলাম।

কয়েকটা পরিচিত নামের রেলস্টেশন পার হলে এলাম—'ভকস্‌হল্‌', উইম্বলডন। ওয়ালটন-অন-টেমস ছোটখাট, শান্ত চেহারার স্টেশন। স্টেশন থেকে ওটেনদের বাড়ি বেশী দূর নয়। মিসেস্‌ ওটেন গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, আগে গাড়ি চালাতাম না। কিন্তু গত বছর দুয়েক উনি চোখে মোটেই দেখতে পান না, তাই এই বৃদ্ধ বয়সে ড্রাইভিং শিখে নিতে হল।

ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে এক টুকরো ফুলের বাগান। অবসর-জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট। বৃদ্ধ ওটেন দম্পতি, আর এক মস্ত বড় আলসেসিয়ান কুকুর—এই নিয়ে সংসার। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, ল্যাজ-নাড়া, সন্দিগ্ধভাবে আমার শাড়ি শুঁকে দেখা ইত্যাদি পর্ব শেষ হলে পর বসবার ঘরে সবাই গুছিয়ে বসলাম।

কেমন আছেন? প্রশ্নের জবাবে ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে ওটেন সাহেব বললেন—চমৎকার আছি। অনেক দিন বাঁচবার আশা রাখি।

কোথায় আমরা ওটেন সাহেবকে নানা প্রশ্ন করব, উনিই আমাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রথমেই বললেন, কলকাতার খবর বলো—আই অ্যাম হাঙরি ফর নিউজ অব ক্যালকাটা। কতদিন কলকাতার খবর শুনি না। পার্ক স্ট্রীট কি তেমনি আছে? কলেজ স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারের চেহারা পালটে গেছে কি? সেনেট হাউস নিশ্চয় আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে? সেনেট হাউস আর নেই শুনে ওটেন সাহেব মর্মাহত হলেন। সে কি! ও'র তরুণ বয়সের কর্মক্ষেত্র কলেজ স্ট্রীট পাড়ার ল্যান্ডস্কেপ তবে তো একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। অন্তত সেনেট হাউসের সামনের দিকের চেহারাটা বজায় রেখে পেছনে অন্যান্য বিল্ডিং করা যেত নাকি?

প্রেসিডেন্সি কলেজের খবর বারবারই জিজ্ঞাসা করলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক হিসেবেই ও'র জীবনের নানা খ্যাতি ও অখ্যাতি। প্রেসিডেন্সি কলেজ পড়াশুনোয় আগের মতই সেরা কলেজ আছে তো—জানতে চাইলেন। মেয়েরাও পড়ছে আজকাল ও-কলেজে শুনে একটু আশ্চর্য হলেন। তবে মেয়েরা পড়াশুনোর ক্ষেত্রে ছেলেদের চাইতে এগিয়ে যাচ্ছে, ভাল করছে, শুনে কিন্তু আশ্চর্য হলেন না একটুও। বললেন, জানি, বাঙালী মেয়েরা বুদ্ধিমতী, সুযোগ পেলেই জীবনে উন্নতি করবে। ও'র লেখা কবিতায় উনি দুজন বাঙালী মহিলা কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। একজন তরু দত্ত, অপরজন সরোজিনী নাইডু।

বহু দিন ধরেই অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওটেন সাহেব। বারেবারেই তাই কলকাতার তথা বাংলার বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার হালচাল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বেশ বিব্রত হচ্ছিলাম। বর্তমানে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা চলছে তা তো আর খুব একটা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াবার মত নয়। বেশ কিছু দিন ওটেন সাহেব আমাদের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা ডি. পি. আই. ছিলেন। উনি যে সময় ডি. পি. আই., সেই সময়েই দার্জিলিঙে ওঁর মেয়ের জন্ম হয়, গল্প করলেন। জানতে চাইছিলেন কোন মহিলা ডি. পি. আই. হয়েছে কি না। কলকাতা য়ুনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর পদ সাম্প্রতিককালে কোন বিদ্বান মুসলমান অলংকৃত করেছে কি? ওটেন সাহেবের বন্ধু ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর হাসান সুরাবর্দী। এক সময় স্কটিশ চার্চ কলেজের কথাও জানতে চাইলেন। বললেন, আমার সময় স্কটিশও বেশ ভাল কলেজ ছিল। সুভাষ তো সেখানেই ভর্তি হল পরে। প্রেসিডেন্সি থেকে বিতাড়িত হবার দু' বছর পর স্কটিশের প্রিন্সিপাল আর্কুহার্ট সুভাষকে ভরতি করে নিয়েছিলেন।

মিসেস ওটেন চা-এর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘরে তৈরি জিনজার কেক, প্লাম কেক ও রকমারি স্যান্ডউইচ প্লেটে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন। ওটেন সাহেব তখনো খোঁজ নিয়ে চলেছেন, কলকাতার ওঁর সব পুরনো বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে। একটা বিশেষ জেনারেশনের কলকাতার নাগরিকদের অনেকেরই উনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, অমুকের ছেলে এখন কি চাকরি করছে? অমুকের মেয়েদের ভাল বিয়ে হয়েছে তো? যে কঠোর চরিত্র ওটেন সাহেব অনেকের কল্পনায় রয়েছেন তার সঙ্গে এই স্নেহশীল মানুষটির মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। ঠিক য়ুরোপ আসার আগে ডাঃ বসুকে ওটেন সাহেব লিখলেন—তোমার সঙ্গে দেখা হবে মনে করে উৎসুক হয়ে আছি।

"It will be interesting to meet not only the Director of the Netaji Research Bureau but also the son of one who was a fellow member of the Bengal Parliament of 1924."

সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন ওটেন সাহেব—ওঁর এই পরিচয়টাই জানতাম। উনি যে আবার সুভাষের অগ্রজ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একসঙ্গে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে ছিলেন সে খবর জানা ছিল না।

ওটেনদের এক প্রতিবেশী বন্ধু আমাদের সঙ্গে চা-এর নিমন্ত্রণে যোগ দিতে এলেন। এই আগন্তুক-বন্ধুকে ওটেন সাহেব খুব গর্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জীবনের নানা কাহিনী ব্যাখ্যা করছিলেন। বলছিলেন, সুভাষের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আই. সি. এস. পরীক্ষা দিল সুভাষ। ও দেখাতে চেয়েছিল কত সহজে, কত অবহেলায় ও এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে। তারপর হেলাভরে সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করে নিজের দেশের সেবা করতে চলে গেল। সুভাষের বহুমুখী প্রতিভার শতমুখে ব্যাখ্যান করছিলেন ওটেন সাহেব।

আর আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল, বহু বছর আগের কথা। ১৯১৬ সাল। জানুয়ারি মাসে ছাত্রদের সঙ্গে জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের বচসা হল। শোনা গেল, অধ্যাপক একজন ছাত্রের গায়ে হাতও তোলেন। অধ্যাপকের নাম এডওয়ার্ড ফারলে ওটেন। ছেলেদের স্টুডেন্ট কনসালটেটিভ কমিটিতে ক্লাসের প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্র বসু অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানালেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়ে গেল। সে আমলে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা সফল ধর্মঘট করতে পারা খুব বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল।

জেমস সাহেব ছাত্রদের বুঝিয়ে বলে মিটমাট করে নিতে বললেন। অধ্যাপক ওটেনকে আড়ালে ডেকে ছাত্রদের সঙ্গে মিটিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন। উভয় পক্ষে শেকহ্যান্ড করে বেশ একটা ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট গোছের ব্যাপার হল। দু' দিন বন্ধ থাকার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ আবার খুলল।

কিন্তু ছাত্ররা একটা ব্যাপারে বেশ ক্ষুব্ধ হল। ক্লাস থেকে অ্যাবসেন্ট থাকার অপরাধে কলেজের আইনমত সব ছেলেদের পাঁচ টাকা করে ফাইন দিতে হল। যারা দারিদ্র্যের জন্য অব্যাহতি চাইল তাদেরই শুধু রেহাই দেওয়া হল। ছেলেরা ভেবেছিল আলাপ-আলোচনার পর যখন মিটমাট হয়েছে, তখন এই ফাইনের ব্যাপার থেকে সকলকেই রেহাই দেওয়া হবে। মনে মনে ছেলেরা খুব চটল।

এর পর ফেব্রুয়ারি মাসে সেই একই অধ্যাপককে কেন্দ্র করে ঘটে গেল আর এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সেদিন একজন অধ্যাপক আসেননি। তাঁর ক্লাস অপর একজন নিলেন ও ঘণ্টা পড়বার পাঁচ মিনিট আগেই ক্লাস ছেড়ে দিলেন। ফলে ছেলেরা করিডরে দাঁড়িয়ে হইচই করে গল্প জুড়ে দিয়েছিল। অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা

যাঁদেরই আছে, তাঁরা বুঝবেন যে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

পাশের ঘরে ক্লাস নিচ্ছিলেন অধ্যাপক ওটেন। গণ্ডগোলে ওঁর মেজাজ গেল বিগড়ে। বেরিয়ে এসে ছেলেদের জোর ধমকে দিলেন। ধমক খেয়ে ছেলেরা চুপচাপ চলেই যাচ্ছিল। এমন সময় 'কমলা' বলে একটি ছেলে অপর একটি ছেলেকে 'পঞ্চানন' বলে ডাক দিয়ে উঠল। ওটেন ফাইলের কাজগপত্রে দেখছি নোট দেওয়া হচ্ছে যে, এ ঘটনায় দোষণীয় কিছু ছিল বলে মনে হয় না। এমনিই এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ডাক দিয়েছিল। কিন্তু ওটেন সাহেবের মনে হল বিশেষ করে ওকে অপমান করার জন্যই এটা করা হয়েছে। উনি ক্লাসের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, ফিরে তাকালেন।

তারপর ঠিক কি হল তাই নিয়েই তো বিতর্ক! ছেলেটি প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করলে যে, তাকে ঘাড়ে ধরে অধ্যাপক 'রাস্কেল' বলেছেন। অপরদিকে বলা হল, উনি শুধু ওর হাত ধরেছিলেন। ছেলেরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল।

অধ্যক্ষ জেমস্ সেদিনই বেলা তিনটেয় ছেলেদের ওঁর ঘরে আসতে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে তখন তীব্র অসন্তোষ। ওদের মনে হল ইংরেজ প্রিন্সিপালের কাছে সুবিচারের আশা করা বৃথা। এখানে ওটেন ফাইলে কিন্তু নোট রয়েছে যে, ছেলেরা প্রিন্সিপাল জেমসকে ভুল বুঝেছিল। জেমসের সহানুভূতি ছেলেদের দিকেই ছিল।

সে যাই হোক, সেদিন ঠিক তিনটের সময় যখন অধ্যক্ষ জেমসের ঘরে মিটিং হবার কথা, কিছু ছাত্র নিজেরাই ওটেনের বিচারেব ভার নিয়ে নিল। ওটেন সাহেব কলেজের মধ্যে গুরুতর প্রহৃত হলেন—আর ইংরেজি ভাষায় একটা নূতন ক্রিয়াপদের জন্ম হল 'ওটেনাইজ' করা। আজকাল হয়ত মাস্টারমশাইদের ওটেনাইজড হওয়া এমন কোন খবর নয়, কিন্তু সে আমলে এ একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। তাও আবার ইংরেজ মাস্টারমশাই ও ভারতীয় ছাত্র।

ওটেন সাহেব চোখেমুখে একটু দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আচ্ছা, সুভাষের ওপর যে সব সিনেমা হয়েছে তাতে আমাকে নাকি সাংঘাতিকভাবে দেখানো হয়েছে? ছেলেদের দিকে তেড়ে যাচ্ছি, সত্যি না কি? আমার মনে পড়ল সুভাষচন্দ্রের জীবনের ওপর বাংলা না হিন্দী কোন সিনেমাতে যেন ওটেন সাহেবকে নাটকীয়ভাবে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখেছি বটে।

আসল ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। প্রেসিডেন্সি কলেজের ওই খাড়া সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লে আর দেখতে হতো না। ওটেন সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সিঁড়ির নীচে যেখানে নোটিশ বোর্ড আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বোর্ডে কি পড়ছিলেন। এমন সময় আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হন। দু' এক সেকেন্ডেই যা হবার তা হয়ে যায়। অধ্যাপক গিলক্রাইস্টও ঠিক তখনি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন—তিনিও ঘটনাটা দেখলেন। কিন্তু ওটেন বা গিলক্রাইস্ট কেউ-ই ছাত্রদেব সনাক্ত করে ওঠার আগেই সবাই হাওয়া।

অধ্যক্ষ জেমস্ তৎক্ষণাৎ 'অন দি স্পট' এনকোয়ারি শুরু করলেন। পরে গভর্নমেণ্ট থেকেও তদন্ত কমিশন বসানো হল। এদিকে এই তদন্ত কমিশনের ব্যাপার নিয়ে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেম্বার লায়ন সাহেবের (Lyon) সঙ্গে জেমসের প্রচন্ড বচসা হয়ে গেল। যার পরিণতিতে জেমস্ সাহেব প্রথম সাসপেন্ডেড হলেন ও পরে রিটায়ার করতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু তার আগেই জেমস্ সাহেব একদিন সুভাষচন্দ্রকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বললেন—সব গোলমালের মূলেই তুমি, তোমাকে আমি কলেজ

থেকে বহিষ্কৃত করলাম। 'ধন্যবাদ' বলে সুভাষচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। •

ওটেনের ঘটনাটিকে সুভাষচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। লিখেছেন, "My Principal had expelled me, but he had made my future career." সেই প্রথম উনি নেতৃত্বের স্বাদ পেলেন ও তার আনুষঙ্গিক লাঞ্ছনা ও আত্মত্যাগ দুটোর অভিজ্ঞতাই ও'র হল।

সুভাষচন্দ্র অন্তত প্রত্যক্ষভাবে এই প্রহারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলেই মনে করা হয়। যদিও সরাসরি ও'কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উনি উত্তর না দিয়ে মুচকে হেসে এড়িয়ে যেতেন। আত্মজীবনীতে উনি লিখেছেন যে, সমস্ত ঘটনাটার উনি "eye witness" ছিলেন। তদন্ত কমিশনের কাছে ছাত্রনেতা হিসেবে ও'কে, একমাত্র ও'কেই শাস্তি মাথা পেতে নিতে হল। উনি দোষী ছেলেদের নাম বলতে স্বীকৃত হলেন না। ঘটনাটা দোষণীয় কি না তার জবাবে বললেন— যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে সই করেছেন আশুতোষ মুখার্জি, সি ডব্লিউ পিক, (Peake) ডব্লিউ হর্নেল (D. P. I.), জে মিচেল এবং হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল সেদিনের সেই ওটেন সাহেব তখন আমার সামনে বসে টেপরেকর্ডে সুভাষচন্দ্রের ওপর লেখা ও'র সনেটটি আবৃত্তি করছেন। চোখে দেখতে পান না বটে, কিন্তু স্মরণশক্তি প্রখর। সুভাষের ওপর স্বরচিত কবিতাটি কণ্ঠস্থ আছে। বেশ স্বচ্ছন্দ, ঋজু ভঙ্গীতে আবৃত্তি করছেন—

Did I once suffer, Subhas,
at your hands?
............I would forget.

সেদিনের সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য আজ আর মনে কোন গ্লানি নেই। বিদ্রোহী ছাত্রের জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে বন্দনা করেই সনেট রচনা করেছেন কবি-অধ্যাপক।

অধ্যাপক ওটেনের আর এক পরিচয় উনি কবি। ও'র কবিতার বই Songs of Aton— একখণ্ড আমার হাতে দিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ও'র বিশেষ অন্তরের যোগের পরিচয় অনেক কবিতাই বহন করছে। এডওয়ার্ড টমসনের উদ্দেশ্যে লেখা একটি কবিতায় বলছেন—তোমার আত্মা আজ কোথায়? শান্তিনিকেতনের কুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রয়েছে কি?

His dust in Oxford lies
His spirit where? Perchance with old Tagore.
Santiniketan's groves he haunts once more,
Sharing its hopes and deep philosophies—

কবি তরু দত্তর ওপর লেখা সনেটের পাশেই রয়েছে সরোজিনী নাইডুর ওপর কবিতা—

Bengal be proud! The torch of flaming fire
Which you lit fell dying from her hand,
When swift another daughter of thy land
Snatched at the flame.........

কিন্তু আমি সব চাইতে আশ্চর্য হলাম 'ইণ্ডিয়া ১৯৪৭' নামে কবিতাটি পড়ে। কবি সেখানে আমাদের কঠোর ভর্ৎসনা করে বলছেন—তোমাদের দেশ তোমরা দু ভাগ করেছ, আকবরের ভারতবর্ষ দু' টুকরো করেছ—ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা

করবে না।

History will say you chose the lesser role
And broke the land.

কবিতার নীচে ফুটনোট দেওয়া আছে। লেখক আশা করেছিলেন ভারতবর্ষ এক ঐক্যবদ্ধ ফেডারেশন Unified Federation) হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করবে—তা না হওয়াতে ও'র মনের হতাশা এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

পার্টিশন অব ইন্ডিয়ার কথা উঠতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ওটেন সাহেব। বারে বারে বললেন, এটা মেনে নেওয়া তোমাদের উচিত হয়নি। কি হতো--না হয় স্বাধীনতা আর কয়েক বছর পিছিয়ে যেত! কিন্তু দেশের সর্বনাশ হতো না। বেশ বুঝতে পারছিলাম এ কণ্ঠস্বর ইম্পিরিয়ালিস্ট ইংরেজের নয়, এ কন্ঠস্বর হল ইতিহাসের অধ্যাপকের। ইতিহাসের আলোতে ভারত বিভাগের বিভ্রান্তি উনি উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশের কথা অবধারিতভাবে বার বার উঠে পড়ছিল। মুক্তি সংগ্রাম তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ওটেন সাহেব বলছিলেন, কত লক্ষ লোকের জীবনের বিনিময়ে এই ভুল শোধরাতে হবে তোমাদের জানো না।

আমি ভাবছিলাম, এই ভারতপ্রেমিক, সুভাষের গুণমুগ্ধ ওটেনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব। এ কি শুধু ওটেনের ব্যক্তিগত উদারতা ও চরিত্রশক্তির পরিচয়? না কি সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে আকর্ষণী শক্তি আছে তাই এর জন্য দায়ী! নয়ত নেতাজীর ইংরেজ জীবনীকার হিউ টয়, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস বা ওটেনকে ব্যাখ্যা করব কি করে! শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মায়ায় অনেকে বাঁধা পড়ত।

আবার ইংরেজের স্বাভাবিক স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিটও এর জন্য দায়ী বইকি। ওটেন সাহেবের সঙ্গে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পত্রালাপ সংরক্ষিত আছে। রিসার্চ ব্যুরো থেকে লেখা একটি চিঠিতে বলা হয়েছিল--আমাদের মনে হয় এবং নেতাজীরও তাই মত ছিল যে, রাজনীতিক বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবের কোনই কারণ নেই। কারণ জীবন রাজনীতির চাইতে অনেক বড়। চিঠির জবাবে ফিরে লিখলেন অধ্যাপক ওটেন--এই সেন্টিমেন্টের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত— "That was the basis of my poem on Netaji !

অপর একটি চিঠিতে আরো বিশদ করে উনি লিখেছেন--বেশীর ভাগ ইংরেজের মত এবং কোন কোন ভারতীয়ের মতও রাজনীতিতে আমি নেতাজীর বিরোধী শিবিরে ছিলাম—তারপরই লিখছেন--"but Englishmen are traditionally ready to shake hands after a fight and to respect an opponent who has fought them vigorously."

॥ আঠারো ॥

লন্ডন থেকে আর একবার ফিরে কনটিনেন্ট-এ আসতেই হল। কারণ মিঃ নাম্বিয়ারের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে গেলে ইতিহাসের সন্ধানে আমাদের এই যাত্রা নিতান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যেত। কথা ছিল ও'র সঙ্গে বন-এ দেখা হবে। কিন্তু বন-এ নেতাজী সম্মেলনে যোগ দিতে আসা নাম্বিয়ারের পক্ষে সম্ভব হল না। খবর এল অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবরটা পেয়েই আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার

কিঞ্চিৎ রদবদল করে সুইজারল্যান্ড হয়ে তবেই দেশে ফেরা স্থির করে ফেললাম। নাম্বিয়ারকে টেলিফোনে সেই রকম জানিয়ে রাখা হল।

লণ্ডন ছেড়ে আসার দিন ভোরবেলা ঘুম সবে পাতলা হয়ে এসেছে, সেই আধো-ঘুম-আধো-জাগরণের মধ্যে শোবার ঘরের দরজার কাছে কীর্তির গলা পেলাম --আজ আর কোন এরোপ্লেন লণ্ডন থেকে ছাড়তে হচ্ছে না। চমকে উঠে বসে জানলার পর্দা সরাতেই চোখের দৃষ্টি কাচের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। বাইরে জমাট কুয়াশা, নিরন্ধ্র অন্ধকার। অথচ আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের এরোপ্লেন ধরতে হবে।

আমার গৃহস্বামিনী সুরং, থাইল্যান্ডের মেয়ে, রন্ধনে দ্রৌপদী। সকালের ব্রেকফাস্টের পাঁউরুটি তাও নিজের হাতে বেক্ করে। নীচে নেমে এসে দেখলাম সুরং দ্রুত হাতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। কীর্তি টেলিফোনে হীথরো এয়ারপোর্টের সঙ্গে বাক্যালাপে রত। এয়ারপোর্ট থেকে বললে—না না, কোন দেরি নেই, সব প্লেন অন্ টাইম ছাড়ছে, চটপট চলে এসো।

পড়ি-মরি করে রওনা হলাম। সাধারণত যা সময় লাগত, কুয়াশার জন্য ডবল সময় লাগবে। কোন অলৌকিক উপায়ে, কিছু না দেখেও, কীর্তি গাড়ি চালাচ্ছে মনে হল। যাবার দিনে এরকম কুখ্যাত লণ্ডন ফগ্-এ পড়ে যেতে হবে কে জানত! এয়ারপোর্টে পেঁছে দরজায় দাঁড়িয়েই কোনমতে বিদায় সম্ভাষণ সেরে নিয়ে কীর্তি আর সুরং ফিরে গেল। এই দীর্ঘ, কুয়াশাবৃত পথ ফিরে পাড়ি দিতে হবে ওদের, মনে করে অস্বস্তি হল খুব।

এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে দেখি গম্‌গম্ করছে সব—'রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম' গোছের আবহাওয়া। কাল গভীর রাত্রি থেকেই লণ্ডন ফগ-এর কল্যাণে একটাও প্লেন ছাড়তে পারেনি। বিপন্ন যাত্রীর ভিড়ে বিমানবন্দর ভারাক্রান্ত। শালোয়ার-কামিজ পরিহিতা পাঞ্জাবিনীরা দীর্ঘ ঝাড়ু হাতে ঘনঘন ঝাঁটপাট দিয়ে এয়ারপোর্ট পরিষ্কার রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বেলা যত বাড়ল, যাত্রীর ভিড়ও তত বাড়ল। একটার পর একটা ফ্লাইট ক্যানসেল করে নানারকম ঘোষণা চলতে লাগল।

আমরা এসেছিলাম ঠিক সকাল ন'টায়। দশটা, এগারোটা বারোটা বাজল—একটার সময় আমাদের সুইস এয়ারের ফ্লাইটও বাতিল ঘোষণা করা হল। রেস্তো-রাঁয় লাঞ্চ খেতে ডাক পড়ল— উইথ দি কমপ্লিমেণ্টস অব সুইস এয়ার। ডাক তো পড়ল, কিন্তু রেস্তোরাঁর সামনে সুদীর্ঘ কিউ। একটা করে টেবিল খালি হচ্ছে আর অল্প ক'জন করে ডাকছে ভিতরে। তিনটে নাগাদ লাঞ্চ ক্লোজড্ বলে নোটিশ ঝুলিয়ে দিতে হল, খাবারদাবারে টান পড়ে গেছে।

অনেক ব্যাকুল আত্মীয়স্বজন বিদেশ-প্রত্যাগতদের রিসিভ করতে এসেছেন বিমান বন্দরে। কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করছেন অমুক ফ্লাইট নম্বরের কোন খবর আছে কি? কাউন্টারের মেমসাহেব নির্বিকারভাবে বললে, সে তো এসে গেছে অনেকক্ষণ। তাই নাকি, কোথায়! জবাব এল, ইট ইজ হোভারিং ইন দি এয়ার' বিমানবন্দরে অবতরণ করা সম্ভব নয়, তাই আকাশপথে চক্কর দিচ্ছে সব প্লেন।

শুনে ভাবলাম, ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমরা অন্তত আকাশে 'হোভার' করছি না, শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। বিমানবন্দরে ডিউটি-ফ্রি শপ, ঘোরাঘুরি করতে করতে দুখানা রেকর্ডই কিনে ফেললাম। বসে বসে চিঠি লিখলাম খান দুয়েক। সকাল ন'টায় এসেছিলাম, সন্ধ্যা ছ'টায় সুইস এয়ারের অপর একটি ফ্লাইটে আমাদের ডাক পড়ল। প্লেনে উঠেও আর এক ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকা। তখন মিনিটে

মিনিটে প্লেন উঠছে আর নামছে। আকাশে বেজায় ট্র্যাফিক-জ্যাম হয়েছে শুনলাম।

পিছনে পড়ে রইল কুয়াশায় ঢাকা লণ্ডন শহর, সুইজারল্যাণ্ডের আকাশে তখন তারা ঝলমল্ করছে। ঝকঝক, চকচক করছে ছবির মত সুন্দর শহর জুরিখ। কিন্তু সেদিকে মন দেবার সময় কোথায়? আমরা তো ট্যুরিস্টজনোচিত মনোভাব নিয়ে জুরিখ দেখতে আসিনি। পরদিন সকালে বানহোফ স্ট্রাসেতে ট্রাম-স্টপেজে দাঁড়িয়েছিলাম, ট্রাম আসতে উঠে পড়লাম।

ট্রামে চড়ে এদিক-ওদিক চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হলাম। য়ুরোপের বেশীর ভাগ দেশে এখন লেবার শর্টেজ, শ্রমিক পাওয়া দুর্লভ। তাই মানুষের করণীয় অনেক কাজ মেশিনে করতে হয়। ভিয়েনাতে ট্রামে উঠে দরজার মুখে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পয়সা ফেলে টিকিটটা কেটে নিতে হতো। এখানে সে রকম কোন যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল না, অথচ কনডাকটরবিহীন ট্রাম। এদিকে দেখতে দেখতে গন্তব্যস্থলে পেঁছে গেলাম। একটু বোকা-বোকা মুখ করে নেমে পড়া ছাড়া আর উপায় কি। রহস্যটা পরে বোঝা গিয়েছিল। এখানে ট্রাম-স্টপেজে একপাশে যন্তব বসানো আছে, সংগে দেওয়া আছে চার্ট—কতদূর যেতে ক' ফ্রাংক দিতে হবে। সবাই চার্টে চোখ বুলিয়ে যথাযোগ্য মুদ্রা যন্ত্রে ফেলে টিকিট কেটে নিয়ে টুপ করে ট্রামে উঠে পড়ছে।

যাই হোক, বিনা টিকিটে নাম্বিয়ারের বাড়ির দরজায় পেঁছে গেলাম। দু'তিনটে সরু গলি একটা ছোট স্কোয়ারে এসে মিশেছে। স্কোয়ারের মাঝখানে একটা ফাউণ্টেন। চারপাশে ঘেঁষাঘেঁষি পুরোন ধাঁচের ঘরবাড়ি। তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে স্কোয়ারের ওপর এক ঝলক রোদ্দুর এসে পড়েছে। নাম্বিয়ার থাকেন বড় সুন্দর জায়গায়। ঠিক মনে হল কোন য়ুরোপীয় চিত্রকলার বই-এর পাতায় পা রেখে দাঁড়িয়ে আছি।

অ্যাপার্টমেণ্টও বড় সুন্দর। বাইরে থেকে বাড়িগুলোর যত সংকীর্ণ চেহারা, ভিতরে কিন্তু প্রশস্ত বেশ কয়েকখানা ঘর। ঝকঝকে কাঠের পালিশ করা দেওয়াল। বসবার ঘরখানা বইয়ে ঠাসা। লম্বা, টানা ঘর। একপাশে জানলার ধার ঘেঁষে লিখবার টেবিল চেয়ার, মাঝখানে লোকজন বসবার সোফা-সেট, অন্য পাশে খাবার টেবিল। এই ঘরেই আমাদের নাম্বিয়ারের সংগে দীর্ঘ আলোচনার সেসন চলত। সামনে টেবিলে টেপ-রেকর্ডারে টেপ ঘুরছে। নাম্বিয়ার একটা চেয়ারে বসে আপন মনে স্মৃতিচারণ করে চলেছেন। নাম্বিয়ার একজন চমৎকার কনভারসেশনেলিস্ট, অর্থাৎ সুদক্ষ আলাপচারী। চোখে-মুখে অভিব্যক্তি, হাত নেড়ে নেড়ে অথচ মৃদুভাবে গল্প করে চলেছেন—বার্লিনে বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালের দিনগুলো আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। ছোটখাট সামান্য টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে নেতাজীকে যেন জীবন্ত করে তুলছেন আমাদের চোখের সামনে। কখনো হয়তো ঈষৎ হেসে আঙুল তুলে বলছেন—এ কথাগুলো কিন্তু অফ দি রেকর্ড। টুক্ করে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করার ক্ষীণ আওয়াজ, তারপর আবার এক সময় টেপ ঘুরছে, ঘুরছে।

অনেকগুলো কারণে নাম্বিয়ারের সংগে এই সাক্ষাৎকার নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়েছিল। নেতাজীর জীবনে য়ুরোপ-পর্ব দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ ত্রিশ দশকে। সেখানে আমরা দেখি তরুণ সুভাষচন্দ্র য়ুরোপের দেশে দেশে ঘুরছেন এবং সব জায়গায় অ্যাকাডেমিক মহলে এবং কোথাও কোথাও রাজনীতিকদের মধ্যেও একটা জোরালো ভারতবর্ষ লবি গড়ে তুলতে পেরেছেন। শেষবার দেখি ১৯৩৮-এর গোড়ায়। য়ুরোপে বসেই খবর পেলেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন উনি। প্রকৃতপক্ষে ইন্ডো-য়ুরোপীয়ান সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপনে সুভাষচন্দ্রের দান অপরিসীম। আজও তার অনেক সুফল আমরা ভোগ করছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে য়ুরোপে উপস্থিত হলেন সুভাষচন্দ্র। এই সময়ে য়ুরোপে নেতাজীর যে বিপুল কর্মকান্ড তা বলা যায় নেতাজীর জীবনে য়ুরোপ-পর্বের দ্বিতীয় ভাগ।

নাম্বিয়ার হলেন এমন একজন যিনি য়ুরোপের এই দুই পর্বেই নেতাজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। লোথার ফ্রাংক প্রথম পর্বে সুভাষচন্দ্রকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ওঁর নেতাজীর সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ। ডাঃ ওয়ার্থ দ্বিতীয় পর্বে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন, কিন্তু প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নাম্বিয়ার কিন্তু ত্রিশ দশকে বার্লিন, প্রাগ, কার্লোভি ভারি, বাদগাস্টাইন—সব জায়গাতে নেতাজীর সঙ্গে রয়েছেন। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর আহ্বান পেয়ে ফ্রান্স থেকে বার্লিন এসে পৌঁছবার দিনটি থেকে একেবারে সেই সাবমেরিনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত নেতাজীর সঙ্গে আছেন ছায়ার মত। নেতাজীর অনুপস্থিতিতে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ওঁর ওপর এল।

আর একটি বিশেষ কারণেও নাম্বিয়ারকে আমার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছিল। এই একজনের দেখা পেলাম, যিনি একই সঙ্গে নেতাজী ও নেহরু এই দুই নেতারই বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। আমার মনে হয় না, এরকম লোক খুব বেশী আছেন। নেহরুর নির্দেশেই ছাত্রাবস্থায় বার্লিনে নাম্বিয়ার একটা ইনফর্মেশন ব্যুরো খুলে সব ভারতীয় ছাত্রদের সেখানে জড়ো করেছিলেন।

পরবর্তীকালে নেতাজীর সঙ্গে যেমন, ত্রিশ দশকে নেহরুর য়ুরোপ সফরের সময় তেমন নাম্বিয়ার নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কিশোরী ইন্দিরা বাবার সঙ্গে কখনো কখনো এসেছে। কোন কাজ পড়ে গেলে নেহরু অনেক সময় বলতেন—ইন্দুকে একটু দেখো, আমি ঘুরে আসছি। প্রাগ-এ একবার একজন পদস্থ চেক অফিসিয়ালের সঙ্গে লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল নেহরুর, জরুরী কথাবার্তা আছে। ইন্দুকে দেখো—বলে চলে গেলেন। নাম্বিয়ার বললেন, ভাবলাম ইন্দিরাকে বাইরে লাঞ্চ খাইয়ে আনি। ঘটনাক্রমে ওরা যে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন, দেখেন সেখানে একপাশে একটি টেবিলে নেহরু বসে আছেন চেক অফিসিয়ালটির সঙ্গে। 'আমরা ওঁদের দিকে আর তাকালাম না, সোজা অন্য পাশে চলে গিয়ে আর একটি টেবিলে বসে পড়লাম,' বললেন নাম্বিয়ার।

একটু হেসে নাম্বিয়ার বললেন, সেদিনের সেই চুপচাপ, শান্ত মেয়েটির মধ্যে আজকের শক্ত হাতে দেশের হাল ধরে থাকা প্রধানমন্ত্রী লুকিয়ে ছিল কে জানত!

নেতাজীর সঙ্গে নাম্বিয়ারের একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, শুধু নেতা ও তার অনুগামী এই সম্পর্কের চাইতে কিছু বেশী। তাই য়ুরোপে ওঁর ব্যক্তিজীবনের আভাসও নাম্বিয়ারের কাজে কিছু পাওয়া যায়। সোফিয়েনস্ট্রাসের বাড়ির বাগানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করে অনেক কথাই হতো দুজনের।

নেহরু ও নেতাজী দুজনেই অপরজনের সঙ্গে নাম্বিয়ারের অন্তরঙ্গতার কথা জানতেন। নেতাজী দুষ্টুমি করে হেসে নাম্বিয়ারকে বলতেন, নাম্বিয়ার, ইউ আর নেহরুজ্ ম্যান! এদিকে স্বাধীনতার পর নেহরুর আমন্ত্রণে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিলেন নাম্বিয়ার। য়ুরোপের বিভিন্ন দূতাবাসে বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন, শেষ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডে আর বন-এ আমাদের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন।

যুদ্ধের মধ্যে নেতাজী যখন বার্লিনে পৌঁছলেন, নাম্বিয়ার তখন নাৎসীদের

হাত এড়িয়ে ফ্রান্সের আনঅকুপায়েড টেরিটরিতে বা মুক্ত এলাকায় এক গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। সেইখানেই নেতাজীর বার্তা ওঁর হাতে পৌঁছল। নেতাজী ডেকে পাঠিয়েছেন খবর পেয়ে নাম্বিয়ার এলেন প্যারিসে। নেতাজীও তখন সেখানে। প্যারিসের এক রেস্তোরাঁয় দুজনের প্রথম সাক্ষাৎকার হল।

নাম্বিয়ারের মনে পড়ে, নেতাজীকে বেশ ভাল স্যুট-পরা দেখলেন। আগে য়ুরোপে অনেক সময় একটু অন্যরকম পোশাকে লম্বা কোট ও মাথায় কাশ্মীরী টুপি-পরা দেখতেন।

সেদিন রেস্তোরাঁয় বসে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল দুজনের। নেতাজী বিশদ-ভাবে এক, দুই পয়েণ্ট করে নাম্বিয়ারকে বলছিলেন—কেন আমি বার্লিন এলাম। নাম্বিয়ার বলছেন, সেদিন যত না বুঝতে পেরেছিলাম, যত দিন যাচ্ছে নেতাজীর যুক্তির সারবত্তা আমার কাছে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্টেটসম্যান ছিলেন উনি, সেটা এখন আরো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করছি।

যেমন, সেদিন উনি বলেছিলেন যে, বাইরে থেকে একটা সশস্ত্র আক্রমণ, একটা মিলিটারি থ্রাস্ট হওয়া নিতান্ত দরকার, তা না হলে ভারত বিভাগ বন্ধ করা কষ্টসাধ্য হবে। দেশ ছাড়ার আগে মিঃ জিন্নার সঙ্গে শেষ যা কথাবার্তা ওঁর হয়েছে, তাতে ওঁর ধারণা হয়েছে যে, পাকিস্তানের আবদার উনি আঁকড়ে থাকবেন। আর ইতিমধ্যে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এত বেশী জল ঘোলা হতে থাকবে যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো পাকিস্তান ঠেকানো যাবে না। এমন একটা সশস্ত্র আন্দোলন পরি-কল্পনা করতে হবে, যাতে দেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। একটা বৃহৎ আদর্শের জন্য মানুষ যখন লড়াইতে নামে তখন অনেক সংকীর্ণ, অনুদার মনোবৃত্তি আপনা থেকেই খসে যায়।

নাম্বিয়ার অকপটে বললেন, সেদিন যত না বুঝেছিলাম, তার চাইতে পরে এবং বিশেষ করে সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই আরগুমেণ্ট কত তাৎপর্য-পূর্ণ ও অর্থবহ ছিল, তা আমি নূতন করে উপলব্ধি করছিলাম।

অবশ্য অন্যান্য বেশীর ভাগ বক্তব্য উনি সহজেই বুঝেছিলেন। নেতাজীর চিন্তায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না ও চিন্তার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য সর্বদাই ছিল। এ ব্যাপারে নেহরুর সম্বন্ধে উনি বলেন, নেহরু নিঃসন্দেহে একজন আদর্শবাদী দেশনায়ক ছিলেন। কিন্তু উনি অনেক সময় ভাবাবেগের বশীভূত হয়ে পড়তেন, ফলে প্র্যাকটিক্যাল রাজনীতিতে ওঁর চিন্তা ও কর্মে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা যেত। নেতাজীর মধ্যে ভাবাবেগ কিছু কম ছিল না। কিন্তু ওঁর লক্ষ্য স্থির থাকত, উনি যা ভাবতেন, তা কর্মে রূপায়িত করতেন। তাছাড়া ঠিক যুদ্ধ বাধার আগে য়ুরোপের রাজনীতি মনে হয় নেতাজী পরিষ্কার বুঝেছিলেন।

সেদিন যখন নাম্বিয়ারের সঙ্গে প্যারিসের রেস্তোরাঁয় নেতাজী কথা বলছিলেন, তখন এই যুদ্ধ ঠিক কিভাবে শেষ হবে তা কারো ধারণা ছিল না। অ্যাটম বোমা, হিরোসিমা-নাগাসাকি কারো দূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

নেতাজী বলছিলেন, জয়-পরাজয় শেষ পর্যন্ত গিয়ে আলোচনার টেবিলে স্থির হবে। যদি নেগোশিয়েটেড পিস্ বা আলোচনাসাপেক্ষ শান্তিই শেষ পর্যন্ত হয়—তবে নেতাজী বলেছিলেন, এ-পক্ষে আমার উপস্থিতি আর অপরদিকে গান্ধী-নেহরু যদি চাপ দিতে পারেন, তবে ভারতবর্ষের জন্য আমরা ভাল টার্মস্ পাব। আর তার প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধকালীন প্রচারের একটা ভূমিকা আছে।

আর যদি জার্মানী বিপুলভাবে জয়লাভ করে, তাহলেও নেতাজী বলতেন, আমাদের নিজস্ব সংগঠন, নিজস্ব সেনাবাহিনী হাতে থাকা দরকার এবং নিরাপদও

বটে। নাম্বিয়ার বলেন, যুদ্ধে জার্মানী জিতবে, নেতাজীর মনে এই "ভীতি" যুদ্ধের প্রথম দিকে বেশ ছিল। পরে অবশ্য অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল। আর যদি যুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় হয়—নেতাজী বলেছিলেন, তাহলেও একটা কথা আমি বলে রাখছি, এই যুদ্ধে ব্রিটেন একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবে। জয়-পরাজয় যারই হোক, ব্রিটেনের শক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে, ব্রিটেন সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার-এ পর্যবসিত হবে। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ওরা দিতে বাধ্য হবে।

আলোচনার শুরুতেই নেতাজী বলেছিলেন, উনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থাকার সময় বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, দেশবাসী বিপ্লবের জন্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরাও তৈরী। কিন্তু কংগ্রেস লীডারশিপ্ উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া ও দেশবাসীর মানসিক প্রস্তুতি কাজে লাগানো কোনটাই তারা করতে পারবে না। খানিকটা নিরুপায় হয়েই নেতাজীকে অন্য পন্থার কথা চিন্তা করতে হল।

ইংরেজরা বলেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কোন সর্বজনস্বীকৃত ভারতীয় নেতা ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ ঘটাতে পারেননি। মুষ্টিমেয় নির্বাসিত দেশপ্রেমিক সামান্য যে চেষ্টা করেছিল, তা এখানে ধরা হচ্ছে না। সেদিনের সেই দীর্ঘ আলোচনায় নেতাজী নাম্বিয়ারকে বলেছিলেন, ইংরেজ যেন আবার এ-কথা বলার সুযোগ না পায় যে, ভারতবাসী এবারও সেই সুযোগ হেলায় হারিয়েছে।

॥ উনিশ ॥

একদিন নাম্বিয়ার বললেন, মাছ খাবে? চলো আজ তোমাদের ভাল মাছ খাওয়াব। কথা বলতে বলতে বাড়ির সামনের স্কোয়ারটুকু পার হয়ে সরু গলি ধরে একটু এগিয়ে গেলাম। স্পিগেলগাসে রাস্তার ওপরই ছোট্ট রেস্তোরাঁ। খেতে খেতে আবার আমাদের গল্প শুরু হল।

রেস্তোরাঁতে বলেই কি না জানি না, নাম্বিয়ারের মনে পড়ল ত্রিশ বছর আগে প্যারিসের সেই রেস্তোরাঁ, নেতাজীর সঙ্গে দেখা হওয়া আর দীর্ঘ আলোচনার কথা। ভাল স্যুট পরেছিলেন নেতাজী, নাম্বিয়ারের নজরে পড়েছিল। পোশাক সম্বন্ধে নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল এ কথা উঠে পড়ল। সাধারণভাবে উদাসীন ছিলেন এ কথা নাম্বিয়ার ও ডাঃ বসু দুজনেই বললেন। কলকাতায় একবার চাদর মনে করে ধুতি কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলেন গল্প শোনা যায়। অবশ্য সুন্দর কোঁচানো ধুতি ও সুদৃশ্য শাল পরিহিত চেহারাও খুবই পরিচিত। তবে নাম্বিয়ার বলছিলেন, প্রয়োজনে উনি পোশাক সম্বন্ধে সচেতন হতেন। যেমন হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে নাম্বিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন—কি পরে যাওয়া উচিত। কারণ এটা শুধু ব্যক্তিগত কথা নয়। উনি যাবেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে, আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ সব কিছুই তাই সতর্কভাবে বিবেচনার যোগ্য।

সেদিন প্যারিসের রেস্তোরাঁয় নাম্বিয়ার নিজের জন্য একটা 'দুবোনে' অর্ডার দিলেন। তারপর নেতাজীর দিকে ফিরে বললেন, আপনার জন্য কফি বলি, কেমন? নেতাজী একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন, তোমার জন্য কি বলেছ? আমারও তাই বলে দাও। নাম্বিয়ার কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, আমার জন্য 'দুবোনে' অর্ডার করেছি।

কিছুই নয় অবশ্য, লাইট এপারেটিফ্ মাত্র। তবুও আপনি তো সাধারণত ওইরকম কিছু নেন না তাই—। নেতাজী তখন নাম্বিয়ারকে একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—দেখো, এবার যখন আমি দেশ ছেড়ে অজানার পথে যাত্রা করি মাথার ওপর একটা বিরাট দায়িত্ব নিয়ে—তখন আমি মনে মনে আমার অনেক পুরোন চিন্তা, পুরোন সংস্কার পিছনে ফেলে এসেছি। পুরোন সংস্কার—নেতাজী ইংরেজিতে কথাটা বলেছিলেন 'ইন্‌হিবিশন্'।

নাম্বিয়ারের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, তাই তো, দেশে থাকতে নেতাজীকে কখনো স্মোক করতেও দেখা যায়নি, ড্রিংকস্-এর কথা চিন্তাই করা যায় না। তাই পরবর্তীকালে যখন ডিপ্লোম্যাটিক পার্টির ছবিতে ওঁকে ওয়াইন গ্লাস হাতে দেখি—কিংবা দেখি ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সপ্রতিভ ভাবে টোস্ট প্রপোজ করছেন, তখন আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু আশ্চর্য ঠেকে বইকি। এর একটা ব্যাখ্যা নাম্বিয়ারের কথায় পাওয়া যাচ্ছে।

নেতাজীর স্মোক করা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্ন লোকের মুখে শুনেছি। যেমন, নেহরু বলেছিলেন মানসিক পরিশ্রমের কথা। এ কাহিনীটি ডাঃ বসুর কাছে শোনা।

একবার কর্মব্যস্ত পার্লামেন্ট সেসনের মধ্যে অল্পক্ষণের বিরতিতে নেহরুর সঙ্গে ডাঃ বসুর সাক্ষাৎ হয়। সিগারেটের টিনটি ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে নেহরু বললেন, ডু ইয়ু স্মোক? জবাব হল, অকেশ্যনেলি। নেহরু তাঁর অনবদ্য, চার্মিং হাসিটি হেসে বললেন—ইজ দিস্ অ্যান অকেশ্যন? এবারে জবাব, কুড বি (Could be !)

এরপর সিগারেট ধরিয়ে ধূমপানের আলোচনা উঠে পড়ল।

কথায় কথায় ডাঃ বসু বললেন, আপনি তো আগে খুব পরিমিত স্মোক করতেন, আজকাল কি একটু বেশী করছেন? নেহরু বললেন, কি হয় জানো, স্ট্রেইন! বেশী স্ট্রেইন হলেই স্মোক করা বেড়ে যায়, সামলানো যায় না। এই ধরো না সুভাষের কথা। ও তো দেশে থাকতে কখনো স্মোক করতই না। কিন্তু পরে খুব হেভী স্মোক করত শুনেছি, চেন-স্মোকার হয়ে পড়েছিল। নিশ্চয় স্ট্রেইন হতো খুব, হবারই কথা, যুদ্ধের সে-সব দিনগুলিতে নিশ্চয় অসম্ভব স্ট্রেইন হতো!

এই প্রসঙ্গেই নেতাজীর স্ত্রী শ্রীমতী এমিলির কাছে একটু ভিন্ন ধরনের কাহিনী শুনেছি। উনি বলেন, নেতাজী যেদিন কাবুল থেকে য়ুরোপের পথে পাড়ি দিলেন সেদিন প্রকৃতপক্ষে কে কাবুল থেকে রওনা হল? রওনা হল তো অরল্যাণ্ডো মাৎসোটা নামে এক ইটালিয়ান। ইটালিয়ানরা সাধারণত কেমন হয়? প্রাণচঞ্চল, হাসিখুশিতে ভরপুর, জীবন-বিলাসী।

কিন্তু এ কেমন ইটালিয়ান? অত্যন্ত সিরিয়াস, গভীর চিন্তামগ্ন, স্মোক করে না, ড্রিংক করে না—এ সব কথা পথ চলতে চলতে নেতাজীই মনে মনে ভাবছিলেন। সেদিন উনি নিজের কাছে নিজে বারবার বললেন, আমি এক দুঃসহ কর্তব্যভার মাথায় নিয়ে দেশ ছেড়ে, আমার এতদিনের পরিচিত জীবন ছেড়ে পথে বেরিয়েছি—এই কর্তব্য সম্পাদনে যা কিছু প্রয়োজন হবে আমি করব, এতটুকুও পিছ-পা হব না। এর জন্যে প্রয়োজনে পূর্ব সংস্কার বিসর্জন দিতেও আমি রাজী।

সমরখন্দের কাছে দুর্জয় শীতে এক জায়গায় নদী পার হবার সময় জীবনে প্রথম স্মোক করেছিলেন উনি। আমি পূর্ব সংস্কার ত্যাগ করলাম—মুখে বলা যত সহজ কাজে মোটেই তা নয়। এর পরবর্তী চ্যালেঞ্জ নেতাজীর সামনে উপস্থিত হল, যখন এই দুর্গম যাত্রাপথে দুদিনের বিরতি হল। জায়গাটি মস্কো শহর। তাই জীবনে প্রথম যে ড্রিংকস-এর পাত্র হাতে তুলে নিতে হল তা ছিল ভড্‌কা। ঘটনাটি

Subhash Chandra Bose.

Obiit 1945.

Did I once suffer, Subhash, at your hand?
Your patriot heart is stilled! I would forget!
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty; Icarus-like your courage planned
To mount the skies, and storm in battle set
The ramparts of High Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, a plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity.
Like Icarus, you sped towards the sea.
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire, that brightly glowed
In India's mighty heart, and flamed and flowed
Forth from her Army's thousand victories won.

E. Farley Oaten

ওটেন সাহেবের নিজের হাতের লেখায় সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত কবিতা

ওটেন সাহেবের সাম্প্রতিক ছবি (১৯৭১) পাশে মিসেস ওটেন ও ডাঃ বসু

এডওয়ার্ড ফাবলে ওটেন যখন প্রেসিডেন্সি
কলেজের তরুণ অধ্যাপক ছিলেন

টেপরেকর্ডার সামনে রেখে স্মৃতিচারণ করছেন নেতাজীর সহযোগী নাম্বিয়ার

বার্লিনে বিদেশী কূটনীতিকদের সঙ্গে নেতাজী. ছবির ডানদিকে নাম্বিয়ার

সচরাচর দেখা যায় না এমন একটি ভঙ্গীতে তোলা নেতাজীর প্রতিকৃতি

পত্নী এমিলি ও কন্যা অনী

"আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। হয়ত পথের শেষ আর দেখিব না
সাবমেরিনে য়ুরোপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নেতাজী, সঙ্গী আবিদ হাসান

শ্রাণ্টের কাছে বিবৃত করে উনি বলেছিলেন—ইট বার্ন্ট্ মি!

নাম্বিয়ার তখন বলে চলেছেন, এমন একটা আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।' জীবনে কোন কিছুতে ওঁর কিন্তু কোন প্রয়োজন ছিল না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস, প্রেম-ভালবাসা কিছুতেই না। জীবনে সব কিছুতে ছিল একটা মহৎ নিরাসক্তি। তা না হলে বার বার সব কিছু পিছনে ফেলে এইভাবে বার হয়ে পড়তে পারতেন কি?

নাম্বিয়ারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল, অনেক বছর আগে, শ্রীদিলীপকুমার রায় পুণা থেকে কলকাতা এসেছেন। নেতাজীভবনে ওঁর একটি গানের আসর বসেছে, সুভাষের প্রিয় গান অনেক সেদিন গেয়েছিলেন, সেদিনের সভার জন্য বিশেষভাবে সুভাষের উদ্দেশ্যে রচিত ওঁর নিজের একটি গান—'জানি না, বন্ধু, তোমায় কি নামে করব বরণ।' নাম্বিয়ারের কথা শুনতে শুনতে আমি যেন দিলীপবাবুর বিশিষ্ট ঢঙে গাওয়া গানটি মনে মনে শুনতে পাচ্ছিলাম—

'ধনমান পায়ে ঠেলে
অকূলের আরাধনে
উদ্দাম দুঃসাহসে
সাধিলে চিরন্তনে।'

গলায় বিভিন্ন কারুকাজ, মাঝে মাঝে বাণীও বদলে দিচ্ছেন—ধনমান পায়ে ঠেলে, ধ—ন মান, যশ মান পায়ে ঠেলে, যশ—মান—।

নাম্বিয়ার বলছেন, আসক্তি নেই বটে; কিন্তু জীবনে চলার পথে না-চাইতে যা উনি পেতেন তার প্রতি কোন অবহেলাও ছিল না। সহজে দু' হাত ভরে উনি তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু জীবনে ওঁর একটিই লক্ষ্য ছিল—হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু। এই লক্ষ্যের দিকে উনি স্থির নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। কিছুতেই ওঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা সম্ভব হতো না। তাই জীবনের কাছে যা পেতেন সহজেই বার বার পথপ্রান্তে ফেলে চলে গেছেন।

আমার মনের মধ্যে দিলীপবাবুর গানের রেশ তখনো বাজছে—

যায় কি ভোলা—
তুমি বলিদান দিয়েছিলে
যা কিছু না চাহিতে
অফুরান পেয়েছিলে?

নাম্বিয়ার বলছেন, একবার দেশ ছেড়ে এলেন। পিছনে পড়ে রইল প্রিয়জনে ভরা বিরাট পরিবার, অগণিত বন্ধু, ভক্ত অনুগামী। আবার একদিন বার্লিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন নিজের জীবনের উপর কঠিন ঝুঁকি নিয়ে—সেদিনও পিছনে ফেলে গেলেন পত্নী ও নবজাতা কন্যা। তিল তিল করে যে সংগঠন উনি গড়ে তুলেছিলেন তাও রইল পিছনে। বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বান এল যেদিন পূর্ব এশিয়া থেকে, এক মুহূর্তও দেরী হল না। একদিক থেকে বলা যায় উনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ—কিন্তু সহস্র বন্ধনের মধ্যে মহানন্দময় সে মুক্তি। যে মানুষটির ছবি নাম্বিয়ার আমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলছিলেন, আমার মনে হয়, এরকম মানুষকেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় আদর্শ সাধক—'অনাসক্ত, অনুরাগী, সংসারী, সংসারত্যাগী।'

নেতাজী ছিলেন নাম্বিয়ারের ভাষায় 'one-idea man', একনিষ্ঠ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল ওঁর দিবসের ধ্যান, রাত্রির স্বপ্ন। এদিক ওদিক চাইবার সময় ছিল না ওঁর একটুও। শ্রীমতী এমিলির কথা হচ্ছিল। নাম্বিয়ার বললেন, একদিক থেকে দেখলে উনিই ছিলেন ওঁর জীবনে 'only departure'। অনেকদিন

য়ুরোপে কাটিয়ে নাম্বিয়ারের ইংরেজি একটু অদ্ভুত ধরনের, কেমন যেন জার্মান-ঘেঁষা হয়ে গেছে। অবশ্যই উনি বলতে চেয়েছিলেন—একমাত্র ব্যতিক্রম, 'only exception'.

জীবনের সবকিছুর মত এ ব্যাপারেও উনি অত্যন্ত সিরিয়াস ছিলেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ও'দের দুজনের আলাপ। দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও আন্তরিক বোঝাপড়ার ওপর ও'দের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল। "He was deeply in love with her—that I know"—নাম্বিয়ার বললেন।

নাম্বিয়ারের কাছে একটা কথা শুনে কিঞ্চিৎ কৌতুকবোধ হয়েছিল, আবার একজন মেয়ে হিসেবে মনে মনে একটু রাগও হয়েছিল। ভিয়েনা থেকে বার্লিনে খবর এসে পে'ছিল নেতাজীর কাছে যে, মেয়ে হয়েছে। নাম্বিয়ার বললেন, উনি খবর শুনে সামান্য হতাশ হয়েছিলেন। কারণ উনি ছেলের আশা করেছিলেন। অবশ্য তখনি উনি সেভাব সামলে নিলেন। আর পরে যখন ভিয়েনাতে শিশুকন্যা দেখতে গেলেন, খুবই গর্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। সেই প্রথম মুখদর্শনের সময় নাম্বিয়ারও উপস্থিত ছিলেন। 'অনীতাকে আমিও সেইদিন প্রথম দেখলাম নেতাজীর সংগে এক সাথে—' নাম্বিয়ার বললেন।

বহু রূপে নেতাজীকে দেখবার সৌভাগ্য নাম্বিয়ারের হয়েছিল। নেতাজীর ক্রোধের একটা গল্প শুনলাম। রোমে এসেছেন নেতাজী। বিয়াল্লিশ সালের শেষের দিকে কোন এক সময় হবে। ঠিক তারিখ নাম্বিয়ারের মনে নেই। যেমন সাধারণত হতো, সংগে এসেছেন ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ার। জার্মান দূতাবাসের কাউন্সিলর ডোটেনবার্গের সংগে ওর অফিসে বসে কথাবার্তা হচ্ছে। ডোটেনবার্গ নেতাজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও চমৎকার মানুষ ছিলেন।

নেতাজী একটি বিশেষ কাজে সেবার রোমে এসেছেন। তখন সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা বলতে গেলে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ত'দের মধ্যে থেকে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন গঠিত হচ্ছে। যদিও সমস্ত যুদ্ধবন্দীই জার্মানীতে বিভিন্ন ক্যাম্পে রয়েছে, কি করে যেন দু'শজনের মত ভারতীয় সেনা ইটালিয়ানদের হাতে বন্দী ছিল। নেতাজীর বক্তব্য হল, এই দু'শজনকে জার্মানীতে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করতে হবে। জার্মান দূতাবাসকেই এই ট্রান্সফারের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে হবে। ডোটেনবার্গের সংগে সেইসব পরামর্শই হবার কথা।

আলোচনার শুরু থেকেই ডোটেনবার্গ কেমন যেন চঞ্চল হয়েছিলেন। যুদ্ধের খবর বিশেষ ভাল না। নর্থ আফ্রিকা থেকে খারাপ খবর এসেছে। হাজার হাজার জার্মান সৈনিকের প্রাণ তখন বিপন্ন। আলোচনার মধ্যেই একবার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনে কথাবার্তার ধরন শুনেই মনে হল আরো কিছু দুঃসংবাদ এল।

রিসিভার রাখতেই নেতাজী আগেকার কথার সূত্র ধরে আবার বলতে শুরু করলেন—'তাহলে এই দু'শজন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর একটা ব্যবস্থা—।' অকস্মাৎ ডোটেনবার্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ডোটেনবার্গ রাগতভাবে বললে—মিঃ বোস, আজ হাজার হাজার জার্মানীর জীবন বিপন্ন—আপনার ওই দু'শজন ভারতীয়ের কথা চিন্তা করা ছাড়াও আমার অন্য কাজ আছে।

তৎক্ষণাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন নেতাজী। মুখ লাল টক্‌টক্ করছে। এত ক্রুদ্ধ হতে নাম্বিয়ার ও'কে কোনদিন দেখেননি। কঠিন, শীতল গলায় যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করতে করতে বললেন, 'মিঃ ডোটেনবার্গ, আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, তোমার কাছে হাজার হাজার জার্মানের যা প্রাণের মূল্য, আমার কাছে এই দু'শজন ভারতীয়ের প্রাণের দাম তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়—হয়ত বা

একটু বেশী। যাই হোক, তোমাকে কাজের সময় বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত।' তুমি আমাকে যে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছিলে আমার পক্ষে তা রাখা আর সম্ভব হবে না। গুড বাই।'

নেতাজী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছন পিছন নাম্বিয়ার ও ডাঃ ওয়ার্থও খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওয়াক আউট করলেন। তখন একটা অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। নেতাজী করিডর দিয়ে গট্‌মট্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। পিছন পিছন ডোটেনবার্গ দৌড়চ্ছেন—'ইওর একসেলেন্সি, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দোষ হয়ে গেছে। আজ আমার মাথার ঠিক নেই।'

নেতাজী কর্ণপাত না করে চলে যাচ্ছেন। ডোটেনবার্গ দৌড়চ্ছেন আর বলছেন—'আমার নিমন্ত্রণে আপনাকে আসতেই হবে, প্লিজ—।'

নেতাজী কিছুতেই কোন কথা শুনবেন না। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডার ওয়ার্থই ধীরে ধীরে নেতাজীকে বুঝিয়ে একটু শান্ত করল। মানুষ মাত্রেরই দোষত্রুটি হয়। প্রকৃতপক্ষে ডোটেনবার্গ অত্যন্ত ভাল ছিলেন। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ও'র কোনদিন হয়নি। সেদিন অত্যন্ত বিচলিত মনের অবস্থায় ছিলেন বলেই অকস্মাৎ ধৈর্যহারা হয়েছিলেন। তাছাড়া ডোটেনবার্গের লাঞ্চের নিমন্ত্রণে অন্যান্য জার্মান, ইটালিয়ান মন্ত্রী ও ডিপ্লোম্যাটদের বলা হয়েছে। সবাই নেতাজীর সঙ্গে মিলিত হতেই আসবেন। এ অবস্থায় একটু শান্ত না হলে কি করে চলে?

॥ বিশ ॥

সুইজারল্যান্ডের দিনগুলো আমাদের বেশ অদ্ভুতভাবে কাটল। শারীরিকভাবে যদিও আমরা সুইজারল্যান্ডে ছিলাম, মনে মনে কিন্তু রইলাম যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বার্লিনে; কখনো বা তারও আগে প্রাক্‌যুদ্ধের দিনগুলিতে অগ্নিগর্ভ য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে। নাম্বিয়ারের গল্প বলার মধ্যে বেশ একটা হিপ্নোটিজম ছিল। আমরা সম্মোহিত হয়ে শুনতাম।

নাম্বিয়ারের চার-দেওয়াল ঘেরা ঘরের বাইরে যে সুইজারল্যান্ডের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা ছড়িয়ে আছে সে কথা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে বসেছিলাম। এমনি সময় সুইজারল্যান্ডেরই আর এক শহর মুটিয়ের থেকে প্রবাসী বন্ধু পার্থ তার গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলেন। আর নাম্বিয়ারের কাছ থেকে আমাদের এক-দিনের জন্য ছুটি নিতে বাধ্য করলেন।

ছোট্ট দেশ সুইজারল্যান্ড। আর অমন তীব্র বেগবান গাড়ি, তার সঙ্গে অমন চমৎকার হাইওয়ে। একদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে প্রায় অর্ধেক সুইজারল্যান্ড দেখা হয়ে গেল। জুরিখ থেকে চুর (Chur) হয়ে লুসার্নে এলাম। লুসার্নে লেকের ধারে বেড়িয়ে, একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খেয়ে আবার রওনা। লুসার্ন থেকে ইনটারলাকেন হয়ে গ্রিনডেলওয়ালড। হ্রদ আর পাহাড়, পাহাড় আর হ্রদ—তার মাঝখান দিয়ে পথ চলে গিয়েছে। দুপুরবেলা এবলিগেন বলে একটি ছোট জায়গায় গাড়ি থামালাম। সেখানে সুদৃশ্য, সুনীল হ্রদের তীরে খাবার জায়গা বেছে নিয়ে হ্রদ থেকে সদ্য ধরে আনা মাছ ভাজা দিয়ে লাঞ্চ সেরে নেওয়া হল।

গ্রিনডেলওয়ালডে পেঁছে গাড়ি ছেড়ে রোপওয়েতে করে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম। সামনে বরফে-ঢাকা 'ইয়ুং ফ্রাউ'র চূড়া, নীচে সবুজ মখমলের মত ঘাস, তাতে গায়ে ছোপ-ছোপ দাগ পুষ্ট চেহারার গরু চরছে আর মাঝে মাঝে সুন্দর

সুন্দর ঘরবাড়ি। বাড়ির উঠোনে কাজ করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখছে সুইস গৃহিণী—ভারতীয় শাড়ির আঁচল উড়তে উড়তে চলেছে রোপওয়ে দিয়ে। এখানে গোপনে বলে রাখি, এমন সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা যতটা উপভোগ করা উচিত ছিল, ততটা পারিনি। এই ধরনের চেয়ার-কার-এ চেপে দাঁড়িতে ঝুলতে ঝুলতে শূন্যপথে যাওয়া আমার এই প্রথম। কিঞ্চিৎ নার্ভাসভাবে জোরে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে বসেছিলাম।

যাই হোক, নাম্বিয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মধ্যে এই বিরতিটুকু আমাদের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মুটিয়ের প্রবাসী বন্ধুকে ধন্যবাদ। সেদিন ফিরবার সময় অন্য পথে বার্ন হয়ে অনেক রাত্রে ফিরলাম।

পরদিন নাম্বিয়ারের বাড়ি যাবার পথে মিসেস ওয়ালটারের দোকানে একবার ঘুরে গেলাম। ইণ্ডিয়া স্টোর নামে ভারতীয় জিনিসপত্রের একটি দোকান খুলেছেন মিসেস ওয়ালটার আজ অনেক দিন হল। আগে দোকানটি ছোট ছিল, বিক্রি তেমন ছিল না। কিন্তু আজ কয়েক বছর হল যত সব 'বিটল' আর 'হিপি'দের কল্যাণে বিক্রি বেড়ে গেছে হু-হু করে। নামাবলী আর তথাকথিত 'গুরু বীড' অর্থাৎ রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রী করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন দোকানের কর্ত্রী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখলাম। মনে ভাবলাম, আজব জায়গা এই য়ুরোপ। সেদিন এক সুইস দোকানে আমি চকোলেট কিনেছিলাম। কিনবার পদ্ধতিটি বেশ অভিনব। কনডাকটরবিহীন ট্রামের মত কর্মচারীবিহীন দোকান। কাঁচের আড়ালে থরে থরে সাজানো আছে রকমারি জিনিস। কাঁচের গায়ে ছোট একটি জানালা, তাতে দু-একটি খোপ আর বিভিন্ন রঙের কয়েকটি বোতাম। একটি খোপে নোট ফেলে দিয়ে একটি বিশেষ বোতাম টিপলাম। অমনি গড়গড় করে একটা যন্ত্র চলতে শুরু করল। বাইরে থেকে দেখছি যন্তরটি সোজা চকোলেটের তাকের দিকে ধাবমান হল, আমার পছন্দমত দুটি চকোলেট তুলে নিয়ে একটা ট্রে-তে ফেলল। তারপর গড়গড় করে ঠেলে জানালার ধারে নিয়ে এল। একটি খোপ দিয়ে চকোলেট দুটি লাফিয়ে বেরিয়ে এল, অপর একটি খোপে টাকা-আনা-পাই সব হিসেব হয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে এল আমার প্রাপ্য খুচরো পয়সা।

আমি তো প্রয়োজন না থাকলেও শুধু মজা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটাকতক চকোলেট কিনে ফেললাম। তাই ভাবছিলাম, একদিকে যন্ত্রের চরম উন্নতি আর একদিকে নামাবলী আর রুদ্রাক্ষের মালা কিনবার ভিড়। আজব দেশ এই য়ুরোপ।

নাম্বিয়ার দাঁড়িয়েছিলেন সিঁড়ির মাথায়, আমাদের অপেক্ষায়। বললেন, কাল রাত্রে শরীর খারাপ গেছে খুব। একটু থেমে থেমে হাঁপিয়ে কথা বলছিলেন। তবু আমাদের নিরাশ করবেন না। সুইজারল্যাণ্ডের দিন ফুরিয়ে আসছে আমাদের। টেপ-রেকর্ডারের সামনে বসে স্মৃতিচারণ করতে করতে চোখ-মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল নাম্বিয়ারের। নেতাজীর কথা বলতে গিয়ে দেহের ক্লান্তি ভুলে গেলেন।

জার্মানী ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এক সময় নেতাজী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। '৪২-এর জানুয়ারিতেই বার্লিনে যখন নাম্বিয়ার ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে যোগ দিতে এলেন, নেতাজীর সঙ্গে দেখা হতে প্রায় প্রথম কথাই নেতাজী বললেন, জার্মানীতে বসে থেকে আর কোন লাভ নেই। তারপর ফেব্রুয়ারিতে যখন সিঙ্গাপুরের পতন হল তখন থেকে উনি প্রতি মুহূর্তে পূর্ব এশিয়া যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত সেই যাওয়া হল। কিন্তু মাঝখানে সময় বয়ে গেল এক বছর। চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন বলে যে য়ুরোপের কাজের কোন সামান্যতম ত্রুটি

হয়েছে তা কিন্তু নয়। আজাদ হিন্দ রেডিওর কাজ, সৈন্য সংগ্রহের কাজ পুরোদমে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর এই সময়কার কাজকর্ম নেতাজী তখন পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন। নাম্বিয়ারের ভাষায় এটা যেন একটা 'প্রলোগ'। বার্লিনে ও রোমে জাপানী ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে কনট্যাক্ট বা যোগাযোগ করার ওপর নেতাজী তখন খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নাম্বিয়ারকে নেতাজী বলেছিলেন, জার্মানরা আমাকে ও ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারকে যে রেকগনিশন বা স্বীকৃতি দিয়েছে, জাপানে আমার কাজ তাতে সহজতর হবে।

নেতাজী যে সময় বার্লিনে এসে পেঁৗছেছিলেন তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি ও'র কাজের খুব অনুকূল ছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী তখনো যুদ্ধে নামেনি। ফ্রান্স পর্যুদস্ত। বস্তুত ইংরেজ তখন একাই জার্মানীর প্রচণ্ড সামরিক শক্তির সম্মুখীন। কিন্তু খুব শীগগিরই যুদ্ধ পরিস্থিতি পালটে গেল।

ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের কার্যক্রম অনেকখানিই তাই প্রিপারেটরি বা পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি হিসেবে পরিকল্পিত। য়ুরোপে বসে অনেক কিছু পরিকল্পিত হয়েছিল, তা কার্যে রূপায়িত হল পূর্ব এশিয়ায়।

য়ুরোপে যে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন গঠিত হল তারা যুদ্ধ করবে কোথায়? নেতাজীর শর্ত হল একমাত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছাড়া তাদের কোথাও ব্যবহার করা চলবে না। নাৎসী অধিকৃত দেশে যেসব নাৎসীবিরোধী রেজিসটেনস্ গ্রুপ গড়ে উঠছে তাদের বিরুদ্ধে তো কখনোই নয়। পরাধীনতার বেদনা কাকে বলে নেতাজী তা ভালই জানতেন। অপর কোন দেশকে পদানত করে রাখার সহায়তায় উনি কোনদিন যাবেন না। বিশেষ করে চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা হয়েছিল নাম্বিয়ারের সঙ্গে। যুদ্ধের মধ্যে নেতাজী নাম্বিয়ারকে নিয়ে প্রাগ-এ এসেছিলেন। নাৎসী অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্দশা নেতাজীকে ব্যথিত করেছিল। ফ্রান্সে ও হল্যান্ডে একটা সংঘর্ষ হয়েছিল এদের, যদিও ইন্ডিয়ান লিজিয়নের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোস্টাল ডিফেন্স বা উপকূল রক্ষা সম্পর্কে মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল এদের। তাই ফ্রান্স ও হল্যান্ডের উপকূলবর্তী ঘাঁটিতে থাকতে হয়েছিল এদের। যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে ফ্রান্সের রেজিসটেনস্ বাহিনীর সঙ্গে ছোটখাট দু-একটা সংঘর্ষ হয়েছিল এদের, যদিও ইন্ডিয়ান লিজিয়নের পক্ষ থেকে এ ধরনের সংঘর্ষ পরিহার করার সব রকম চেষ্টা করা হতো।

ইন্ডিয়ান লিজিয়নকে দু-ভাগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একভাগে থাকবে সিক্রেট সার্ভিসের একটি ছোট দল। এরা রেডিও বার্তা আদান-প্রদান করা ও অন্যান্য কৌশল শিখে অগ্রবর্তী দল হিসেবে যুদ্ধের সময় কাজ করবে। অন্যভাগে থাকবে বড় মুক্তিবাহিনী। জার্মান সিক্রেট সার্ভিস পদ্ধতিতে একটি ছোট দলকে সুশিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। কথা ছিল এরোপ্লেনে করে এদের নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষে নামানো হবে।

কিন্তু য়ুরোপে যা কিছু প্ল্যান হয়েছিল, কাজে লাগল পূর্ব এশিয়াতে। জার্মানীর ইন্ডিয়ান লিজিয়ন সুযোগ পায়নি। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে অ্যাংলো-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা ভারতবর্ষের উপকূলে অবতরণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই সিক্রেট সার্ভিস প্রসঙ্গে হিমলার সম্পর্কে শোনা একটি কাহিনী মনে পড়ছে। আজ যখন আমরা অন্যান্য নাৎসী নায়কদের মতই হিমলারের নাম শুনি, তখন নাসিকা কুঞ্চিত করি। কিন্তু মানুষ বড় জটিল, একদিক থেকে তাকে বিচার

করা যায় না। ডাঃ ওয়ার্থ আমাদের বারে বারে বলতেন, হিমলার ছিলেন একজন সত্যিকারের ভারত-প্রেমিক। নাম্বিয়ারও সে কথা বললেন। সম্প্রতি আজাদ হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের মেজর স্বামী হিমলার সম্বন্ধে এই গল্পটি বললেন। ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন-এর সিক্রেট সার্ভিসের ট্রেনিং-এর ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য নেতাজী ও হিমলারের মধ্যে একটা বৈঠক হল একবার। দেড় ঘণ্টার ওপর কথা হল দুজনে। নেতাজী ফিরে এলে পর মেজর স্বামী এবং অন্যান্যরা জানতে উৎসুক—কি কথা হল! নেতাজী একটু রহস্যময়ভাবে বললেন, কাজের কথা অর্থাৎ সিক্রেট সার্ভিসের ট্রেনিং-এর কথা পনেরো মিনিটে শেষ। এরা সবাই শুনে অবাক! সে কি! তা হলে দেড় ঘণ্টা ধরে এত কি কথা হল? নেতাজী একটু হেসে বললেন, হিন্দু ফিলজফি নিয়ে আলোচনা হল, বেশ গভীর, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

যুদ্ধবন্দী ও ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাম্বিয়ার কয়েকটি কথা বলেছিলেন। কোন যুদ্ধবন্দীকেই জোর করে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে ঢোকানো হয়নি। যারা বুঝিয়ে বলার ফলে এসেছিল তারাই শুধু ছিল। ফলে এক বিরাট সংখ্যক ভারতীয় যুদ্ধবন্দী জার্মান বন্দিশিবিরে রয়ে গিয়েছিল—যারা ইণ্ডিয়ান লিজিয়নেও যোগ দেয়নি অথচ অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের তুলনায় জার্মানদের কাছে মোটের উপর ভাল ব্যবহার পেত। ওদের কোন লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হতো না। নাম্বিয়ার মুচকে হেসে বললেন, ক্যাম্পে বসে বসে এরা তাস খেলছিল—প্লেয়িং কার্ডস্।

'৪৪ সালে যুদ্ধের যখন খারাপ অবস্থা, জার্মানরা নাম্বিয়ারকে বললে, লুক হিয়ার, এই যে লোকগুলো, না তোমাদের কাজে লাগছে, না আমাদের। তুমি অনুমতি দাও, আমরা এদের বিভিন্ন লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে অন্তত একটু কাজে লাগাই। এ নিয়ে ওরা একটু পীড়াপীড়ি করতে লাগল। নেতাজী য়ুরোপ থেকে চলে যাবার পর যে কোন জরুরী সিদ্ধান্তে আসতে হলে নাম্বিয়ার চিন্তা করতেন, এ ক্ষেত্রে নেতাজী হলে কী সিদ্ধান্ত নিতেন!

একটু ভেবে নিয়ে নাম্বিয়ার দৃঢ়ভাবে জার্মানদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা চলবে না। নাম্বিয়ার বললেন, এ নিয়ে বেশী জোর করলে ওঁর ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বন্ধ করে দিতে হবে, নয়ত পদত্যাগ করতে হবে। নাম্বিয়ারের এই সিদ্ধান্তের ফলে এরা বেশ বহাল তবিয়তে রয়ে গেল এবং যুদ্ধশেষে ইংরেজরা এদের সুস্থ, সবল অবস্থায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। জার্মান লেবার ক্যাম্পে গিয়ে পড়লে এদের মধ্যে বেশির ভাগই নিঃশেষ হয়ে যেত।

এরা আবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিতে পুনর্বহাল হল এবং স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতবর্ষের সেনা হিসেবে দেশের সেবা করার সুযোগ পেল। ভাগ্যের পরিহাসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীতে তাদের আর ঠাঁই হল না। তদানীন্তন ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন এই সব 'দলত্যাগী' সৈনিকদের ফিরিয়ে নিলে আর্মি ডিসিপ্লিন নাকি আর থাকবে না। অবশ্য ও'রা বলেছিল, বেসামরিক কাজকর্মে যোগ দিতে কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু এই সব অফিসার ও সৈনিকেরা অনেকে পুরুষানুক্রমে সেনাবাহিনীতে রয়েছে, এতদিনের কেরিয়র বিসর্জন দিতে পারা তাদের পক্ষে কঠিন হল।

তাই পাকিস্তান সরকার যখন ঘোষণা করলেন, তাঁরা এদের সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিতে রাজী, তখন নেতাজীর বেশ কিছু বিশ্বস্ত, কর্মক্ষম, পদস্থ মুসলিম সামরিক অফিসার, যারা নেতাজীর প্রেরণায় জাতি-ধর্ম বিভেদ ভুলে অবিভক্ত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আর্মিতে চলে যেতে বাধ্য হলেন। আজকের পশ্চিম পাকিস্তানে এ'দের কয়েকজন আজও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

নেতাজীর নেতৃত্বে প্রথমে জার্মানীতে ও পরে পূর্ব এশিয়ায় ধর্ম ও আঞ্চলিকতার বিভেদ ভুলে ভারতবাসী যেভাবে একতাবদ্ধ হয়েছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনো সে রকম হয়েছে কি না সন্দেহ। এই একতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণ থেকে হয়েছিল, এর জন্য ওপর থেকে কোন নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। সংখ্যালঘুদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নেতাজীর অবশ্য তীক্ষ্ম নজর থাকত। ছোট একটি উদাহরণ দিলেন নাম্বিয়ার। আকবর খান নামে একজন মুসলমান ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে ছিলেন। ভারী ভালোমানুষ। আকবর খান একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালে রইলেন অনেক দিন। হাসপাতালে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বাছবিচার ছিল আকবরের। নেতাজী নাম্বিয়ারকে ডেকে বলে দিলেন যে, প্রতিদিন আকবর খানের খাবার হাসপাতালে পেঁছে দিতে হবে। 'কি মুশকিল দেখো তো'—নাম্বিয়ার বললেন, 'সব জরুরী কাজ পড়ে থাকত, দু-বেলা আমাকে খাবার পেঁছে দিতে হাসপাতালে দৌড়তে হতো।'

যাই হোক, যে কথা হচ্ছিল—নাম্বিয়ার বলছিলেন, নেতাজী য়ুরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ায় কিভাবে যাবেন, নানারকম পরিকল্পনা করা হয় আর বাতিল হয়। '৪২-এর অক্টোবর নাগাদ একটি পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে বাতিল করতে হয়। নেতাজী তো বললেন, দরকার হলে সারফেস শিপ অর্থাৎ সাধারণ জাহাজে চড়েই চলে যাবেন। ওই যুদ্ধের মধ্যে জার্মান গভর্নমেণ্ট বললে যে, ওভাবে যাওয়ার চেষ্টা করা মানে বিপদের ঝুঁকি আশি পার্সেণ্ট। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে এভাবে যাওয়ার কোন মানে হয়? শেষ পর্যন্ত স্থির হল সাবমেরিনে যাওয়া হবে।

নেতাজী শিশুর মত খুশি ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। নাম্বিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি কোথায় গেলে সাবমেরিন দেখা যাবে খোঁজ নিয়ে সাবমেরিন দেখতে চলে গেলেন। নাম্বিয়ার হেসে বললেন, সাবমেরিন দেখে আমার চক্ষুস্থির! আমি হলে তো এত দীর্ঘ পথ সাবমেরিন চড়ে যেতে কখনোই রাজী হতাম না—একটু হাত-পা মেলবার জায়গা নেই। নেতাজীর সে-সব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। যাবার নেশায় ভরপুর।

সাবমেরিন যাত্রার ব্যবস্থা করতে আবার বেশ কিছুদিন সময় লেগে গেল। বাধাবিপত্তির আর শেষ নেই। জাপানীরা প্রথমে প্রস্তাব করেছিল বর্মার উপকূলে সাবমেরিন বদলের ব্যবস্থা হবে। জার্মানরা তা যথেষ্ট নিরাপদ মনে করল না। অতএব মাঝ-সমুদ্রে সাবমেরিন বদলের ব্যবস্থা হল। এই বিলম্বে নেতাজী অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলেন। ও'র মত আশাবাদী মানুষকে এত ধৈর্যহারা হতে নাম্বিয়ার কখনো দেখেননি। এই সময়ে ওসীমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও কাওয়াহারার বাড়িতে লাঞ্চ খাবার গল্প নাম্বিয়ার করেছিলেন। এত ব্যস্ত হবার অবশ্য কারণও ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত তখন দামী। যদি আর একটু আগে পূর্ব এশিয়ার সংগঠনে হাত দিতে পারতেন তবে হয়ত আরো কাজ হতো।

বার্লিনের এই শেষ দিনগুলির কথা ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ারের কাছে যেমন শুনেছি তেমনি শ্রীমতী এমিলির কাছেও কিছু কিছু শুনেছি। অক্টোবর '৪২ নাগাদ চলে যাবার অন্য পরিকল্পনা স্থির হয়ে গিয়েছিল। নেতাজী বার্লিন থেকে ভিয়েনা এলেন ও'র সঙ্গে দেখা করে যেতে। বিদায় সম্ভাষণ হয়ে গিয়েছিল—'উই সেড্ গুডবাই টু ইচ্ আদার', শ্রীমতী এমিলি বললেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে যাত্রা স্থগিত

রাখতে হয়েছিল। সাধারণত যা হয় তা মোটের উপর ভালোর জন্যই হয়। তখন চলে গেলে কন্যাকে দেখতে পেতেন না, অনীতার জন্মের আগেই চলে যেতে হতো। ইতিমধ্যে ডিসেম্বরে আর একবার ভিয়েনা ঘুরে গেলেন, অনীতাকে দেখে গেলেন।

তেতাল্লিশ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র বার্লিনে ডেকে পাঠালেন এমিলিকে। মাত্র ছয় সপ্তাহের শিশুকন্যা, কোনমতে তার দেখাশুনোর ব্যবস্থা করে রেখে বার্লিনে এলেন উনি। শেষ কয়েকটি দিন সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতে কাটল।

॥ একুশ ॥

অবশেষে এল ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩। য়ুরোপে নেতাজীর শেষ দিন। জানুয়ারীর মাঝামাঝি শ্রীমতী এমিলি এসে পৌঁছেছিলেন বার্লিনে। য়ুরোপ ছেড়ে যাবার আগে শেষ কয়েক সপ্তাহ একদিক থেকে নেতাজীর খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছিল। অপরদিকে সাবমেরিন যাত্রার ব্যাপারটা নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তার অবধি ছিল না। শর্মা, আর্ণিট, ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার সকলের কাছে শোনা টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে এ দিনগুলির একটা আভাস আমরা পেয়েছিলাম।

২৩শে জানুয়ারী ছিল নেতাজীর ছেচল্লিশতম জন্মদিন। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের বন্ধু ও সহকর্মীরা বেশ জাঁকজমক সহকারে জন্মদিনের উৎসব করেছিলেন। নেতাজীর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একখানি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে উপহার দেওয়া হল ও'কে। চারিদিকে আনন্দ কলরোলের মধ্যে কে যেন প্রস্তাব করেছিলেন, সামনের বছর এই দিনটি কেমন করে পালন করা হবে। নেতাজী হঠাৎ বললেন—সামনের বছর এদিনে আমি খুব সম্ভবত তোমাদের মধ্যে থাকব না। থমকে গেলেন সকলে একটু। নেপথ্যে যাত্রার প্রস্তুতি যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে সে খবর গোপন রাখা হয়েছিল সযত্নে।

তারপর এল ২৬শে জানুয়ারী। পরাধীন ভারতবর্ষে এ দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে পালিত হতো। বার্লিনে এয়ারফোর্স হাউসে আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠান হল সেদিন। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সামনে নেতাজী জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বললেন, দেশে রাজরোষের ভয়ে এই দিনটি সর্বদা নিঃশঙ্ক চিত্তে পালন করতে পারেন না ভারতীয়রা। সমবেত দর্শকদের কাছে উনি বর্ণনা করলেন, বারো বছর আগে কলকাতার মেয়র থাকার সময় এই দিনটিতে উনি যখন একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা নিয়ে রাজপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিশ বর্বরের মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজও তাঁর দেহে সেদিনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। উনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনে দেবে প্রাচ্যের সব দেশে স্বস্তি। "A free India will mean that the countries of the Near, Middle and Far East will breathe freely—".

তারপরেই ২৮শে জানুয়ারী কয়নিগসব্রুকে সাড়ে তিন হাজার মুক্তিসেনার সমাবেশে ভাষণ। নেতাজীর সামনে দিয়ে এরা মার্চ পাস্ট করে গেল, স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সেনাবাহিনী। প্রচণ্ড শীতে খোলামাঠে অনুষ্ঠান হয়েছিল। সৈনিকেরা জানত না, কিন্তু নেতাজী জানতেন, আজকের এই স্যালুট ওদের কাছ থেকে ও'র শেষ অভিবাদন। আর আজকের বক্তৃতা হল ও'র বিদায় অভিভাষণ।

এই পুরো সময়টা নেতাজীর শরীর ভাল ছিল না একটুও। হয়ত সাবমেরিন

যাত্রার ব্যাপারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ এর জন্য অনেকখানি দায়ী। যাই হোক, টুক্‌টাক্‌ ওষুধ খেতেন, ইনজেকশন নিতেন। মাঝে মাঝে বিশেষ কোন ওষুধের সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে উঠে এর উপকারিতা আন্টিকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতেন।

অথচ আবিদ হাসান বলেন যে, দীর্ঘ তিন মাস সাবমেরিনে করে যাওয়ার সময় ওঁর শরীর খুব 'ফিট' ছিল। আসলে উনি কাজে ব্যাপৃত থাকলেই ভাল থাকতেন। সাবমেরিনে প্রকৃতির মুক্ত আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত, শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নেতাজী নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আবিদ হাসানকেও ব্যস্ত করে রাখতেন। পূর্ব এশিয়া নেমেই যে সমস্ত কাজে হাত দিতে হবে তার পরিকল্পনা সাবমেরিনে বসে তৈরি হতো।

সাবমেরিন যাত্রা নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তা নেতাজীকে কতখানি কাতর করেছিল সে কথা নাম্বিয়ারের কাছে বিশেষ ভাবে শুনেছি। এক সময় এমনও মনে হয়েছিল, আর হয়ত যাওয়া হয়ে উঠবে না। নাম্বিয়ারকে বলেছিলেন—my luck is out. জাপানী রাষ্ট্রদূত ওসীমা তার স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ভঙ্গীতে কেবলি বলেন—নিশ্চয় যাওয়া হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কি! শেষ পর্যন্ত জাপানী কাউন্সিলর কাওয়াহারার বাড়িতে সেই স্মরণীয় লাঞ্চ; কাওয়াহারার মুখে সুখবর শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন নেতাজী। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন, সামান্যই জিনিস, গুছিয়ে নিলেন। আবিদ হাসানকে তৈরি থাকতে খবর দেওয়া হল।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, ভোরবেলা বার্লিনের লেহর্টার বানহোফ থেকে নেতাজী কীলগামী (Kiel) ট্রেনে উঠলেন। সঙ্গে গেলেন নাম্বিয়ার, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ ও কেপলার। আবিদ হাসান অবশ্যই সঙ্গে আছেন। শ্রীমতী এমিলির ওপর নির্দেশ ছিল, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব বজায় রেখে কিছুদিন সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতে থেকে যেতে হবে। 'অতএব আমি আরো কিছুদিন শূন্য গৃহে linger করলাম'—বললেন উনি।

বার্লিন ছেড়ে চলে যাবার আগে মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখে রেখে গেলেন সুভাষচন্দ্র। লিখলেন—"পরম পূজনীয় মেজদাদা, আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোন সংবাদ দিতে পারিব না।"

নাতিদীর্ঘ এই চিঠির শেষে মেজদাদার প্রতি একটি অনুরোধ—

"আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ।..."

চিঠি শেষ হল"—ইতি বার্লিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩। তোমার স্নেহের ভ্রাতা সুভাষ।"

যুদ্ধের শেষে যথাকালে এই চিঠি মেজদাদার হাতে এসে পৌঁছল। ১৯৪৮-এ সস্ত্রীক শরৎচন্দ্র ছেলেমেয়েদের কয়েকজনকে নিয়ে ভিয়েনা এসে পৌঁছলেন এমিলির সঙ্গে মিলিত হতে। পারিবারিক এই মিলন একাধারে মধুর ও বেদনাময় হয়েছিল একথা সহজেই অনুমেয়।

শরৎচন্দ্রের নির্দেশে বিভাবতী দেবী আপন হাতের চুড়ি খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন এমিলিকে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত স্নেহের এই চিহ্ন হাত থেকে এক মুহূর্তের জন্যও খোলেননি উনি। এবার আমাকে দেখালেন—একটু কষ্ট হচ্ছে,

ছোট হয়ে গেছে হাতে। সেদিনকার অস্ট্রিয়ান সুন্দরীর তন্বী চেহারা এখন তো তেমনটি আর নেই।

এদিকে ট্রেনে যেতে যেতে আবিদ হাসান জিজ্ঞাসা করলেন নাম্বিয়ারকে—আমি কোথায় চলেছি বলো তো? নাম্বিয়ার বললেন—কি জানি! এই যাত্রার ব্যাপারে গোপনীয়তার খুব কড়াকড়ি ছিল। আগেরবার ইটালিয়ানদের দিক থেকে খবরটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ভ্যাটিকান সিটি ছিল স্পাইদের স্বর্গ। এবার ইটালিয়ানদেরও এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। হাসান বিশ্বস্ত সৈনিকের মত আহ্বান পেয়ে চলে এসেছেন, কিন্তু কোথায় যাবেন জানতেন না। একটু ভেবে নিয়ে নিজেই বললেন—আমার মনে হয় আমাকে এথেন্সে পাঠানো হবে। একবার ইন্ডিয়ান লিজিয়নের একটা শাখা এথেন্সে খুলবার প্রস্তাব হয়েছিল।

পকেট থেকে গ্রীক গ্রামারের বই বার করে পড়তে পড়তে চললেন আবিদ হাসান।

য়ুরোপে শেষ রজনী কীল-এ এক হোটেলে কাটিয়েছিলেন নেতাজী। নাম্বিয়ার, ওয়ার্থ, আবিদ হাসান সকলেই ছিলেন। পরদিন সকালে চলে যাওয়ার সময় যেন একটু অহেতুক তাড়াহুড়ো হল—অন্তত নাম্বিয়ারের সেদিন সেইরকম মনে হয়েছিল। সময় বড় তাড়াতাড়ি বয়ে যাচ্ছে। সকালে সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন হোটেলে। একবার শুধু বললেন—সব রেডি, লাগেজ রেডি? গাড়ি ওদের সকলকে নিয়ে চলল। পেঁছেই নেতাজী সাবমেরিনে উঠে গেলেন, পিছন পিছন উঠল আবিদ হাসান। স্টেট সেক্রেটারি উইলহেলম্ কেপলার একটা ছবি তুলে রাখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেপলার ছবি তুলে ওঠার আগেই ভুস্ করে জলের নীচে চলে গেল সাবমেরিন।

নাম্বিয়ার ও ওয়ার্থ সেই শেষ দেখলেন নেতাজীকে।

আর জীবনে দেখা হল না। কিন্তু ওয়ার্থ ও নাম্বিয়ারের জীবনে নেতাজীর সাহচর্যে অতিবাহিত অবিস্মরণীয় এই দিনগুলি দিক্‌চিহ্নের মত হয়ে রইল। শুধু ওয়ার্থ বা নাম্বিয়ারের কথা নয়, যারাই সামান্য সময়ের জন্যও নেতাজীর কাছাকাছি এসেছেন, তাদের প্রত্যেকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারা আর ভুলতে পারেননি।

এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন—এমন নয় যে এই দিনগুলির পরে তাদের জীবন হতাশাপূর্ণ ছিল। তবুও এই দিনগুলি যেন ওদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন এমনি একটা মনের ভাব ওঁদের মধ্যে দেখেছি।

আবার নেতাজীকে ঘিরে ওদের মনের মধ্যে শুধু যে একটা গর্বের স্থান রয়েছে তাই নয়, কি এক বেদনার স্থানও রয়েছে। খুব সহজে সেখানে আঘাত লাগে।

মনে পড়ে লক্ষ্মী সায়গল এসেছেন কলকাতায় নেতাজী 'অরেশন' দিতে। মঞ্চের ওপর বসে আছেন। সে বছর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো থেকে নেতাজীর কণ্ঠস্বরের একটি রেকর্ড বার করা হয়েছিল। সভার শুরুতে রেকর্ডটি বাজিয়ে শোনানো হল। অকস্মাৎ নিস্তব্ধ সভায় নেতাজীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'My countrymen in East Asia—'; মঞ্চের ওপর রুমালে চোখ ঢাকলেন শ্রীমতী লক্ষ্মী। পরে ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে বলেছিলেন, হঠাৎ নিজেকে সামলাতে পারলাম না—সেই কণ্ঠস্বর, সেই আহ্বান!

আবিদ হাসান একই কারণে কিছুকাল আগে কলকাতায় এসেছিলেন। নাম্বি-

ম্যারের মতই স্বাধীনতার পর আবিদ হাসান আমাদের ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। ডেনমার্ক-এ আমাদের রাষ্ট্রদূত থাকার সময় কিছুকাল হল অবসর গ্রহণ করেছেন।

কলকাতায় থাকার সময় আমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে ঠুক্ ঠুক্ করে অরেশন টাইপ করতেন। আমার ধারণা ছিল আমার চাইতে টাইপিং-এ ধীরগতি আর কেউ হতে পারে না। হাসান সাহেব আমাকেও হার মানালেন। টাইপ করতে করতে হঠাৎ হাঁকডাক করতেন—শুনে যাও তো এ জায়গাটা কেমন লিখেছি। শুনবার জন্য হয়ত বারান্দায় এসে জড়ো হলাম সবাই।

হয়ত সাবমেরিনের দিনগুলির কোন একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা পড়তে শুরু করলেন। নেতাজী ডিকটেশন দিচ্ছেন, আবিদ হাসান নোট নিচ্ছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নারী বাহিনীর পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করছেন সেদিন। এমন সময় সাবমেরিনের চোখে ধরা পড়ল সমুদ্রের বুকে শত্রু পক্ষের মালবাহী জাহাজ। একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ঠিক যে মুহূর্তে সাবমেরিন থেকে টর্পেডো রিলিজ্ করা হচ্ছে, কন্ট্রোলে যে ছিল তার সামান্য ভুলের ফলে সাবমেরিন জলের ওপর ভেসে উঠল এবং শত্রুপক্ষের নজরে পড়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের এক চরম বিশৃঙ্খলা। সাবমেরিন আবার জলের তলায় ডাইভ করেছে। ফ্রেইটার জাহাজটি তীব্র বেগে ছুটে এসে সাবমেরিনের ওপরকার রেলিংএ মারলে এক ধাক্কা। সবসুদ্ধ কাত হয়ে একদিকে টলে পড়ল সাবমেরিন। আবিদ হাসান বলছেন, আমি তো আর নিজের মুখের চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অপর সকলের মুখে প্রত্যক্ষ করছি মৃত্যুভীতি। এমন সময় নেতাজীর শান্ত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল—'হাসান, আমি একটা পয়েণ্ট দু'বার বললাম, তুমি কিছুই নোট করছ না।' বুক ঢিবঢিব করছে. হাতের আঙুল কাঁপছে ঠকঠক করে—'সরি, স্যার'—বলে আবিদ হাসান আবার লিখতে শুরু করলেন।

এসব গল্প কিন্তু সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে মোটেই শোনা হয়ে ওঠেনি। দু'-চার লাইন পড়েই হাসান সাহেবের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে যেত, পড়া আর হতো না। শেষের দিকে ও'র ভয় ধরে গেল—আমি কি 'অরেশন' দিতে পারব? লোকের সামনে ইমোশনাল হয়ে পড়লে বড় বিশ্রী হবে।

যারা সে বছর ও'র 'অরেশন' শুনেছেন, তারা স্মরণ করতে পারবেন একটি অত্যন্ত সুলিখিত 'অরেশন' নিতান্ত নীরসভাবে পড়েছিলেন উনি। আমরা যারা জানি, তারা জানতাম যে ইমোশনাল হয়ে পড়বার ভয়ে খুব আড়ষ্টভাবে পড়ে গেলেন লেখাটা।

এতসব কথা আমার মনে পড়ছিল, একদা রাত দুটোর সময় রোম এয়ারপোর্টে পায়চারি করতে করতে। 'সম্রাট শা-জাহান'-এর অপেক্ষায় মাঝরাত্রে বেশ কয়েক ঘণ্টা রোম এয়ারপোর্টে কাটাতে হল। সম্রাট শা-জাহান আমাদের জাম্বো জেট। একদিন শা-জাহানই আমাদের য়ুরোপে নামিয়ে দিয়েছিল, আজ আবার ঘরের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। মাঝরাত্রে ঝিমন্ত চেহারা বিমান-বন্দরের। একদিকের সোফায় কয়েকটি আফ্রিকান যুবক নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। খদ্দেরবিহীন ডিউটি-ফ্রি দোকানের মেয়ে দুটি কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে। নিস্তব্ধ বিমানবন্দরে গমগম করে কি একটা ঘোষণা ভেসে এল—নাইরোবি যাবার প্লেন ছাড়বে একটা। আফ্রিকান যুবকেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের সহযাত্রী একজন এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারের লোকটিকে গিয়ে বলছেন—সারা রাত এয়ারপোর্টে ঠায় বসিয়ে রাখলে? একটু রোম শহরে ঘুরিয়ে আনতে পারতে! কাউণ্টারের লোকটি বিব্রত হয়ে বললে, এত রাত্রে কি আর দেখবেন! জবাব হল—কেন, রোমান

কলোসিউম দেখতাম।

বসে থাকলে বেজায় শীত করে। তাই পায়চারি করছিলাম আর নানান চিন্তা মাথায় ঘুরছিল। ইতিহাসের সন্ধানে এই যে ছুটোছুটি, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, মলিন বিবর্ণ ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে আনা, এসবের সার্থকতা কি? যারা সুভাষচন্দ্রকে দেখেছিল, তাদের জন্য প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। কিন্তু যারা সেদিন ছিল না, যারা তাকে কোনদিন দেখেনি তাদের জন্য এর সার্থকতা আছে বইকি!

আবিদ হাসান সাহেব কলকাতা থাকার সময় আমাদের সঙ্গে যে আনন্দমুখর কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলেন তখনকার আর একটি কথা মনে পড়ছিল। সারা দিন নানা কাজের শেষে বাড়িতে ফিরেই হাসান সাহেব একটা হাঁক দিতেন—কৃষ্ণাজি! যেখানেই থাকি ছুটে আসতে হতো। তখনি বলতেন—এবার গান শোনাও। গান বলতে দুটি মাত্র গান। একটি "তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে-রতনে", অপরটি "তোমায় আমি ভুলব না গো, তোমার্ কথা পড়বে মনে।"

পর পর সাতদিন একই গান শোনাবার পর আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—আপনি রোজই এই দুটো গানই খালি শুনতে চান, এর কি বিশেষ কোন কারণ আছে? আবিদ হাসান বললেন, প্রথমটার তেমন কোন কারণ নেই। এমনিই ভাল লাগে। টেগোর বড় সুন্দর করে বলেছেন—গানের মধ্যে যেন ফুটে উঠেছে নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন প্রেমের কথা—ম্যানস্ ইটার্নেল লাভ ফর উওম্যান। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় গানটি ভাল লাগার একটু বিশেষ কারণ আছে।

কথাটা বলেই হাসান সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। একবার নিজের মনে গুন গুন করে গেয়েও উঠলেন—"তোমায় আমি ভুলব না গো, তোমার কথা পড়বে মনে।"

ও'র গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আর সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না—কাকে উনি ভুলবেন না? এ কি ও'র কোন হারানো প্রিয়া না ও'র হারিয়ে-যাওয়া নেতা?—কার কথা ও'র মনে পড়বে?

সেদিন তাই আর জবাবটা শোনা হয়নি। তবে য়ুরোপে ঘুরবার সময় সকলের মুখেই এক 'ভুলিব না'—শুনতে শুনতে মনে হতো জবাবটা একরকম পেয়েই গেছি।

এ'রা না হয় ভুলবেন না। কিন্তু আজও যারা জন্মে নাই তব দেশে, দেখে নাই যাহারা তোমারে—তাদের জন্য প্রয়োজন আছে ইতিহাসের সংগ্রহশালার। তা ছাড়া 'ভুলিব না' বলা সহজ, শেষ পর্যন্ত বলতে হয়- ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি—সে সে বহুদিন হল।

সবদিক বিবেচনা করলে এই যে টুকিটাকি কাগজপত্র—কোথায় ওটেন সাহেবের লেখা কবিতা, কোথায় টেপ-এ ধরে রাখা নাম্বিয়ারের স্মৃতিকথা, চেকোশ্লোভাকিয়াতে পাওয়া চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, জার্মান আর্কাইভস-এর দলিল, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির নথিপত্র—সংগ্রহ করে আমরা ফিরে চলেছি, আমাদের জাতীয় জীবনে একদিন এর মূল্য নিশ্চয় অপরিসীম হবে।

পৃথিবীর সব দেশেই জাতীয় নেতাদের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা হয়। আমেরিকাতে দেখেছিলাম লিংকন মিউজিয়াম, লিংকনের আততায়ী বুথের পায়ে জড়িয়ে গিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া জাতীয় পতাকাটিও রয়েছে সেখানে। ওয়াশিংটন শহরের অদূরে মাউন্ট ভেরননে আছে জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ি। এমন সুন্দর জীবন্তভাবে সাজিয়ে রাখা সে বাড়ি, মনে হয় বাড়ির বাসিন্দারা একটু বুঝি বাইরে গেছে, এখনি ফিরবে। চোখে দেখিনি কিন্তু শুনেছি, লেনিন মিউজিয়ামও একটি

দেখবার মত জিনিস।

সব দেশেই নিজেদের গৌরবময় জাতীয় জীবন থেকে প্রেরণা পায় তরুণেরা। নেতাজীর বিচিত্র জীবনকথা আমাদের উত্তরসূরীর কাছে চিরন্তন প্রেরণা হবে। সেই কারণেই তথ্যভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সব কিছু সংরক্ষণ করা এত জরুরী। কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এত তথ্য যে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সেও আশ্চর্য। হিটলারের দোভাষী পল স্মিডথ মিউনিকে একবার বলেছিলেন—তোমরা ভাবছ সব কিছু হারিয়ে গেছে, দেখবে কিছুই হারায়নি, সব আছে। কথাটা একাধিক অর্থে সত্য।

শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পাবার কয়েক দিন পর বলেছিলেন, 'আজ এই যে বাংলাদেশ হয়েছে—তা একথাই প্রমাণ করে, নেতাজী অমর' (সাক্ষাৎকার ১৭ই জানুয়ারী '৭২)। উনি কি বলতে চেয়েছিলেন তা আর একটু বিশদ করে দিলেন ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে পাঠানো টেপ-রেকর্ড করা বাণীর মধ্যে। বললেন—"স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ চিরকালের জন্য বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।"

সেই পাথেয় সঞ্চয়ের কাজ যদি সামান্যও অগ্রসর হয়ে থাকে তবেই ইতিহাসের সন্ধানে এ যাত্রা সার্থক।

সেদিন রোমের এয়ারপোর্টে অবশ্য শেখ সাহেবের এসব কথা মনে পড়ার সুযোগ ছিল না। তিনি তখনো কারান্তরালে। সেদিন আমার মনে পড়ছিল এক বাঙালী কবির লেখা কয়েকটি লাইন। আমাদের জীবনে নেতাজী যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা সে কথা শেখ সাহেব গদ্যে যেমন বলেছেন, একালের এক প্রবীণ বাঙালী কবি কবিতায় সেই একই কথা বড় সুন্দর করে বলেছেন। রোম এয়ারপোর্টের সুদীর্ঘ লাউঞ্জ এক মাথা থেকে আর এক মাথা পায়চারি করতে করতে সেই কবিতাটিই মনের মধ্যে গুনগুন করছিলাম—

'যে প্রেরণা যুগে যুগে উত্তরিবে সুদুর্গম পথ
বীর্যবলে পার হবে অরণ্যানী সমুদ্র পর্বত
তুমি সে প্রেরণা;
যে বাণীর তূর্যনাদে ধিক্কৃত হইবে পাপী,
সমনস্ক হবে অন্যমনা
তুমিই সে বাণী—
তারই মাঝে, হে অমর, আছো তুমি, আছো তুমি
আছো তুমি জানি।'

—

বর্ণানুক্রমিক সূচী